নিয়ন্ত্রণ এবং রোগলক্ষণ

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

গত বাইশে মে, ২০০০ অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে *মার্জিন অফ মার্জিন — প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেনট্যান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর*। (ইংরিজি অক্ষরে লেখার সময় 'মার্জিন অফ মার্জিন'-এর দুটো 'এম'-ই ছোট হাতের)। এই বইয়ের পাঁচটি চ্যাপ্টারে, প্রিফেস এবং সাপ্লিমেন্টে যে বিষয় যে তত্ত্বগত অবস্থান এসেছে তাদের নিয়ে, আমরা ঠিক করি, বাংলায় পরপর কয়েকটা প্রবন্ধ লেখার। একটা আলগা প্ল্যান, পরে তাদের মিলিয়ে একটা বই করার, সেটাও ছিল। প্রথমটা বেরোয় গত বছর, ৯৯ পুজোয় *অনুষ্টুপ* পত্রিকায়। 'ডিকন্সট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন'। এবছরে, মানে ২০০০-এ, বেরোচ্ছে দুটো, একটা *অনুষ্টুপ*-এ আর একটা *অপর*-এ। এই প্রবন্ধগুলো যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু করতে করতেই বুঝতে পারছি, কিছু মৃদু কেলো রয়ে যাচ্ছে, কতকগুলো খোলা সুতো বুনোটের মধ্যে থাকছেনা। কী আর করা যাবে। কিছুটা জায়গা নয় রয়েই গেলো পাঠকের নিজের মাথায় পাকিয়ে তোলার। যদি কখনো বই হয়ে বেরোয় তখন এই সমস্যাটা মেটানো যাবে।

একটা টেকনিকাল কথা : বাংলায় ইটালিক্স মানে হেলিয়ে লেখাটা জেনুইনলি কেমন একটা এলিয়ে যায়, ক্যাবলাটে দেখায়, তাই সমস্ত জার্গনগুলোকে প্রতিশব্দগুলোকে নিম্নরেখ বা আন্ডারলাইন করে দেওয়া হল।

১।। উন্মোচন/বন্ধন

নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি-কে নানা জন নানা ভাবে বুঝতে চেয়েছেন। নানা পথে। সেই অজস্র পথের থেকে দুটোকে আমরা বেছে নিচ্ছি আমাদের আলোচনায়। একটা রেজনিক-উল্ফ এবং অন্যটা লাকলাউ-মুফের। এই দুটো পদ্ধতিই আমাদের পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিতুলনায় আনা যায় : এই তিনটি তত্ত্বগত অবস্থানের মধ্যে একধরনের একটা আত্মীয়তা আছে।

রেজনিক-উল্ফের পদ্ধতির মূল দুটো ত্রুটিকে বারবার চিহ্নিত করা হয়েছে উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক আলোচনায়। এক, তারা এবং তাদের তত্ত্বকাঠামো মার্ক্সবাদী। দুই, তারা মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির বর্গ (ক্যাটিগরি) গুলোর ভিত্তিতে তাদের কাঠামোটাকে নির্মাণ করেছেন। কুলীন আকাডেমিকতার জগতে যারা কেউই ঠিক জলচল নয়। পোস্টমডার্নিজমের সঙ্গে তো মার্ক্সবাদের আরো আড়াআড়ি — পারলে রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে হাঁটে। রেউ-র (বারবার রেজনিক-উল্ফ লেখা যাচ্ছেনা, যুক্তাক্ষর টাইপ করা যে কী জিনিষ) এই তত্ত্বে, তাই, পোস্টমডার্নিজমের মানে পোস্টমডার্নিস্টদের কানে যে কোনো জল যাবেনা এটা জানা কথা।

আমাদের আলোচনা শুরু করার জন্যে, রেউ যাকে কৌশলগত বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম বলেছেন, সেরকম একটা কিছু আমাদের বেজায় দরকার। দু-এক কথায়, ছোট করে (যদিও ছোট করা মানেই কিছু না কিছু সর্বনাশ করা) রেউর কৌশলগত এসেনশিয়ালিজমটা একটু বলে নেওয়া যাক।

ঈশ্বর পৃথিবী পয়দা করেছেন, পৃথিবীর সবকিছু চূড়ান্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন এটা ভাবা মানেই ঈশ্বর নামক বিন্দু থেকে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্ত কিছু বয়ে আসছে ভেসে আসছে এরকমটা ভেবে নেওয়া। এই বিন্দুটা সেক্ষেত্রে অনড়, অপরিবর্তনীয়, প্রদত্ত, এক্সোজেনাস। এই বিন্দুটাই, যার নাম ঈশ্বর, ওই ঈশ্বরবিশ্বাসীর তত্ত্ববিশ্বের মূল, সার, এসেন্স। হেগেল তার তত্ত্বকাঠামো খাড়া করেছেন এইরকমই একটা 'মূল'-কে কেন্দ্র করে। তাকে ডেকেছেন 'এসেন্স' বলে, যার থেকে গজিয়ে উঠছে প্রবাহিত হয়ে আসছে আমাদের চারপাশের প্রতীয়মান পৃথিবীর সমস্ত কিছু : প্রতিটি বস্তু — হেগেল যার নাম দিলেন 'অ্যাপিয়ারেন্স'। যে দুনিয়ায়, যে দুনিয়ার মাধ্যমে এসেন্স প্রকাশিত, প্রতিভাত হয়ে ওঠে (*শাইনস ফর্থ*), সেটাই অ্যাপিয়ারেন্স। মার্ক্স-এও এরকম একটা চূড়ান্ত বিন্দুর ধারণা রয়েছে — অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার বা বিমূর্ত শ্রম। তার থেকে প্রবাহিত হয় পণ্য তথা বাজার তথা সুধী সমাজ। মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির রক্ষণশীল ঘরানায়, সমাজকাঠামোর বেস বা ভিত্তি হল অর্থনীতি, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার, তার উপর গজিয়ে ওঠে উপরিকাঠামো, সুপার স্ট্রাকচার — কালচার বা সংস্কৃতি।

আলথুসের এই মার্ক্সীয় তত্ত্ববিশ্বের অন্দরে প্রথম শোরটা তৈরি করলেন অতিনির্ণয় বা ওভারডিটারমিনেশন-এর কথা বলে। বললেন যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক (ইকনমিক, পলিটিকাল এবং ইডিওলজিকাল)

নামে এই তিন ঘূর্নী প্রত্যেকটি অন্য প্রত্যেকটিকে অতিনির্ণয়-এর ভিত্তিতে বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয় হল সরাসরি কারণ দ্বারা কার্য-কে নির্ণয়-এর সম্পর্কের চেয়ে আরো গভীর জটিল এবং বেশি কিছু। কার্য-কারণ সম্পর্ক বা কজ-এফেক্ট রিলেশন-এর নিরিখে ভাবা যাক। কারণ আগে, কার্য পরে। কারণ থেকে কার্য ফলো করে। অর্থাৎ, কারণ কার্যকে নির্ণয় করে। সম্পর্কটা একমুখী। ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক। কিন্তু, যদি এমন হয় যে কেউ আর কারণ বা কার্য নয়? দুজনেই ক১ আর ক২? ক১ এবং ক২ দুজনেই দুজনকে নির্ণয় এবং নির্মাণ করে? তখন, সেই অবস্থায়, সম্পর্কটাকে আমরা বলব অতিনির্ণয়।

কিন্তু, এইসব ঘূর্নী দিয়ে জল ঘুলিয়ে তোলার পরেও শেষ অব্দি আলথুসের বললেন, শেষ মুহূর্তে, ইন দি লাস্ট ইনস্ট্যান্স, দৃশ্যতঃ ঘোলাটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে আসলে একেশ্বর অর্থনৈতিকের দ্বারাই নির্ণীত হচ্ছে অন্য দুটি। খেয়াল করুন : খিড়কি দুয়োর দিয়ে মার্ক্সকে ঢুকিয়ে আনা হল, মার্ক্সও ঠিক এটাই বলেছিলেন, অর্থনীতিই নির্ণয় করে সংস্কৃতি ইত্যাদিকে। এটা করতেই হল আলথুসেরকে নইলে তার মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিশ্ব যে ভেঙে পড়ে। (নাকি, ভেঙে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তার, আলথুসেরের, বিশ্বস্ততা? আগুনখেকো জঙ্গী কমিউনিস্ট নেত্রী এলেনার স্বামীর? যে এলেনাকে নিজের হাতে হত্যা করা দিয়ে আলথুসেরের দাম্পত্য শেষ হয়েছিল?)

রেউ এই আলোচনায় ঢুকছেন ঠিক এইখানটাতে। তাঁরা জানালেন, যদি অতিনির্ণয় দিয়েই পুরোটাকে বুঝি এবং ব্যাখ্যা করি তাহলে শেষ অব্দি কিছুই আর করার বা বলার থাকেনা। কারণ, কিছু করতে গেলে তার আগে কিছু বুঝতে ও বলতে হয়, আর, যেটুকুই বলতে যাই না কেন, তাকে বুঝতে গেলে বিশ্বপৃথিবীর প্রতি কিছু প্রতিটি কিছুকে তার আগে, আগে থেকে, বুঝে নিতে হবে। ধরুন, অসম্ভব, অসম্ভব কম কেয়ার করি আমরা যার জন্যে তা হল একটা ফিগ — এতো প্রবচনেই আছে। এবার একটা ফিগেরও কোনো পরিকল্পিত ডিসফিগারমেন্ট বা পরিবর্তন করতে হলে, আপনাকে আগে বুঝতে হবে ফিগটাকে, তাকে কি বোঝা যায় তার কোষে কোষে বহমান জৈবণিক শক্তির ব্যাকরণ মানে জীববিজ্ঞান ছাড়া? জীববিজ্ঞানটা বুঝবেন কী করে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বাদ দিয়ে, অর্থাৎ, গণিত ইত্যাদি। আর এই বিজ্ঞানগুলোকে আপনি কী ফিগ জানবেন এদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ছাড়া? আর বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ আর কী-ই বা নৃতত্ব মানে সংস্কৃতি ব্যতিরেকে, দেখা মানে তো চোখের পিছনে মগজের ইতিহাসটাও।

অর্থাৎ, আপনাকে মিনিমাম কিছু সচেতন ভাবে করতে গেলেও তার আগে পৃথিবীর যাবতীয় কিছুকে জেনে এবং করে আসতে হবে — যা কখনোই সম্ভব না। তাই, কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করতে গেলে, কোনো কিছু ঘটাতে গেলে কৌশলগত ভাবে একটা অনড় স্থিরতাকে ঢুকিয়ে আনা দরকার। যেখান থেকে কোনো ক্রিয়া বা তত্ত্ব শুরু করা যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক যার আর কোনো 'আগে' নেই। এই করাটা সেই অর্থে শর্তাধীন — আগে থেকেই এটা জানা যে এই ব্যাখ্যার নির্ভুলতার একটা সীমা থাকবে, একটা অমোঘ এবং অনিবার্য সীমা, থাকবেই, কারণ যে স্থিরতা থেকে শুরু করেছিলাম সেটাই আসলে নেই। এটাই স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম। কাজ চালানোর জন্যে একটা এসেন্স বানিয়ে তোলা, ভগবান নেই জেনেও একটা ভগবান পয়দা করে নেওয়া।

কিন্তু মনে রাখবেন এটা একটা প্যান্ডোরার বাক্স, প্রদত্ত অনড় স্থিরতার যে বন্ধ বাক্সটাকে আমরা খুলে ফেললাম। শুধু খুলে ফেললেই হবেনা, বন্ধও করতে হবে। কার্য-কারণ সম্পর্কটা বহুমুখী এই কথা বলা মানেই ওই স্থির অনড়তাটাকে অপনোদন করা — পুরো কাঠামোটাকে খুলে টুকরো টুকরো করে ভিত্তার করে ফেলা, কিন্তু লাটাই তো একসময় গোটাতে হবে, যদি কিছু করতে হয় — এই বাস্তবতাকে যদি বদলাতে হয়। শুধুই, 'জটিল', 'আরো জটিল', 'আরো আরো জটিল' ... এই করে গেলেই তো চলবে না। থামাতে হবে একজায়গায়। এই উন্মোচন এবং সমাপ্তি — ওপেনিং এবং ক্লোজার — এদের ভিতরে একটা কেজো সম্পর্ক তৈরি করে স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম।

আমাদেরও একটা কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম দরকার, আমাদের কথা শুরু করার জন্যে, আমাদের আরব্ধয় পৌঁছনোর জন্যে, চুপিসাড়ে, শিকারীর নিঃশব্দ পায়ে যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই, চিহ্নিত করতে চাই আমাদের 'মার্জিন অফ মার্জিন'-কে। তারকোভস্কির স্টকার যা বলেছিল 'জোন'-এর ভিতর সেই 'রুম'-এ কী ভাবে পৌঁছতে

হয় — সেই কথাগুলো মনে করুন — অনেক সন্তর্পনে সেখানে পৌঁছতে হয়, তাও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর। নইলে কিছুতেই সেখানে পৌঁছনো যায়না, অজানা অচেনা সব ভুলভুলাইয়ায় পথ হারিয়ে যায়।

আমরা আমাদের পথভোলা উদাস উদ্ভ্রান্ত দিওয়ানা অপর — মার্জিন অফ মার্জিন-কে খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করছি কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম-এর যন্ত্রপাতি, যেগুলো তৈরি হয়েছে পৃথিবী উত্তরআধুনিক হয়ে যাওয়ার পর, মানে, বাজারে যখন পোস্টমডার্নিজম এসে গেছে, পোস্টমডার্নিজমের অনন্ত উন্মোচণের অভিঘাতে সবই যখন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। গোলমেলে এবং ঘোলাটে হয়ে গেছে পুরনো চেকপোস্টগুলো। মডার্নিস্ট মতামতের জগতে কথা বলার আরাম ছিল, সবকিছুই বেশ থিতু শান্ত পোক্ত, আর এ এক হতচ্ছাড়া কেলোপ্রবণ পৃথিবী — যখন তখন, কোনো ওয়ার্নিং ব্যাতিরেকেই, বেড়াল যাচ্ছে রুমাল হয়ে, কখনো বা সেই রুমালই হয়ে গেল সাগর পাড়ি দেওয়ার পাল, কোনো কিছুরই কোনো মা-বাপ নেই। ফার্স্ট জেনারেশন পোস্টমডার্নিজম-এর এই উন্মোচণের উপর, যখন ইতিমধ্যেই স্থির অনড়তার সংস্কারকে ফার্স্ট জেনারেশন পোস্টমডার্নিজম দূরীভূত করেছে, সেই সর্বব্যাপী তরলতার বসুন্ধরায় রেজনিক-উল্ফ আনলেন একটা আপাত-শাসন, স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর। এটা সেকেন্ড জেনারেশন উত্তরআধুনিকতা। তাই আমাদের তত্ত্ব থার্ড জেনারেশন পোস্টমডার্নিজম, স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজমকে (সম)আলোচনা করতে করতে যেখানে আমরা পৌঁছচ্ছি।

লাকলাউ-মুফের কাজও (এখন থেকে লামু) গড়ে উঠেছে এই কৌশলগত এসেনশিয়ালিজম-কে ব্যবহার করে। স্পিভাক যখন আমেরিকার অ্যাকাডেমিয়ায় তার দেরিদা-অনুবাদ আর দেরিদা-বিক্রির কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে লামু একটা আস্ত বই নামিয়ে ফেলেছিলেন — দেখিয়েছিলেন কী ভাবে পোস্টমডার্ন উণ্মোচনের মধ্যেই রয়ে যায় একটা নিয়ন্ত্রিত সমাপ্তির, হেজেমনিক ক্লোজারের উদ্ভাষ এবং সম্ভাবনা — থাকতেই হয়, নইলে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তো উঠে যাবে।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, ধরুন, স্থির অনড়তা তো নেই, ফলতঃ অটুট একটা সমগ্রও নেই — এটা তো বুঝলাম। কিন্তু, আর একবার, বেশ কষে ভাবুন তো, সত্যিই কি নেই কোনো সমগ্র? সিয়া-এফবিআই-এর কম্পুটার নেটওয়ার্ক — এক ধরনের একটা সমগ্র তো সেখানে ধরা আছেই। অর্থাৎ, ক্ষমতার বা পাওয়ারের কাছে একধরনের একটা সমগ্র আছেই। যা দিয়ে সে শাসন করে তার বাস্তবতাকে। আর রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বে সমস্ত সমগ্রকেই অস্বীকার করা মানে, নাকচ করা মানে, ক্ষমতার এই সমগ্র তো এই তত্ত্বের নিতান্তই ধরাছোঁয়ার বাইরে, শুধু সেই ক্ষমতার শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাব্য আপাত-সমগ্রকে, তাই একভাবে প্রতিরোধকেই রেজিস্টান্সকেই নাকচ করা।

ক্ষমতা, পাওয়ার থাকা মানে তার একটা নিয়ন্ত্রণ, হেজেমনি আছে, সেই হেজেমনির ক্রিয়াভূমি হিশেবে একটা সমগ্রও আছে। অর্থাৎ, লক্ষ্য করুন, গ্রামশির এসেনশিয়ালিস্ট আলমারি থেকে নিয়ন্ত্রণ, হেজেমনির ধারণাকে টুঁঢে আনলেন লামু, এবং এবার তাকে স্বচ্ছন্দে লটকে দিলেন পোস্টআধুনিকতার হ্যাপি-গো-লাকি কাঁধে। জোয়াল তোমাকে টানতেই হবে খোকা, যতই তুমি অন্তহীন উন্মোচণের কথা বলো, পালাবে কোথায়, পাওয়ারের হাত থেকে নিস্তার নেই। তরী ছেড়ে যদি তরু হও তবু ঝোড়ো হাওয়া ডালে লাগবে। পোস্টমডার্ন ধীমানদের জগতে এজন্যে লামুর প্রশংসা বড় কম নয়, যদিও আমাদের দেশে, ধরুন কলকাতায়, লাকলাউ-মুফের নাম বড় কমই শোনা যায়। লামুর কৃতিত্ব এই জায়গাটায় যে পোস্টমডার্নিজমের অরাজক উণ্মোচনের আবহাওয়ায় এক ধরনের একটা বন্ধন এনেছেন তারা, স্বেচ্ছাপরবশ উণ্মোচক একজিবিশনিস্টদের শায়েস্তা করতে বসিয়েছেন একজন ডিসি-আনক্লোদিং-কে। এদিক থেকে লামুকে শিবসেনা বা কমুনিস্টদের আত্মীয় বলা যেতে পারে, উণ্মোচন যারা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। এমনকি সে কন্দর্পকান্তি মিলিন্দ বা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী পূজা হলেও। আমাদের কট্টর মার্ক্সবিরোধী পাঠকরা আশ্বস্ত থাকুন, মার্ক্সবাদী বর্গ গুলোকে, যুক্তি-নির্মাণকে ঘোষিত ভাবে সরাসরি পরিত্যাগ এবং প্রত্যাখ্যান করেন লামু। লামুর মতাদর্শকে ডাকা হয় পোস্ট-মার্ক্সিজম নামে। মার্ক্সীয় খানদানে তাদের রক্তের সম্পর্ক যেটুকু যা তা ওই গ্রামশির সঙ্গেই।

আমাদের অনেকের কাছেই নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি শব্দটা বলা মানেই, *দাদা সাবধান মাশটার কিন্তু গ্রামশি পড়িয়ে দিচ্ছে*। এর বাইরেও হেজেমনি ধারণার বৃহত্তর মার্ক্সীয় প্রক্ষেপ আছে বৈকি। সেগুলো বরং বাদই দেওয়া যাক, আপাতত ধরে নি, হেজেমনি মানেই গ্রামশি। গ্রামশি 'নিয়ন্ত্রণ' বা 'হেজেমনি' নামে সেই পদ্ধতিটাকে ধরতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে একটা পুঁজি কাঠামোয় সমাজের ক্ষমতাসীন অংশের চিন্তা চেতনা ধ্যানধারণা সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকেই শাসন করে। গ্রামশির প্রতি লামুর সমালোচনা এই যে গ্রামশিকথিত হেজেমনি ধারণাটির তলায় তলায় বয়ে চলেছে একটা মডার্নিস্ট অটুট সমগ্রের বোধ, একটা এসেনশিয়ালিস্ট চিন্তনপ্রক্রিয়ার অন্তঃসলিলা। এই গুপ্ত এসেনশিয়ালিজমের পাদপীঠ থেকে গ্রামশিবাদী নিয়ন্ত্রণ ধারণাটিকে উৎপাটিত করতে চান লামু। এবং তাকে পুনঃআবাহন করতে চান পোস্টমডার্নিস্ট মন্দিরে, এমন মন্ত্রের উচ্চারণে যা আর একটুও এসেনশিয়ালিস্ট, সারবাদী নয়। এবং তারা নিশ্চিত, এই নব-কলেবর হেজেমনি পোস্টমডার্নিজমের ওই শেষহীন উন্মোচনে নিয়ে আসতে পারে একটা ক্লোজার বা সমাপ্তি ।

ফলতঃ আমরা যা পাই তা আর গ্রামশির হেজেমনি নয়, হেজেমনি-র একটা লামু-সংস্করণ। আমরা আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন, যাকে আমরা তৃতীয় বিশ্ব বলেও ডেকেছি কখনো কখনো, তার জন্যে একটা তত্ত্বকাঠামো প্রস্তুত করতে চাই হেজেমনির এই লামু-ধারণার বিপরীতে। এজন্যে আমাদের একটু গ্রামশিচর্চাও করে নিতে হবে, গ্রামশির যে যে উপকরণগুলো লামু কাজে লাগিয়েছিলেন, যদিও আমাদের সেই গ্রামশিচর্চা কখনোই হুবহু লামুর পথে নয়। লামুর বিষয়ে আমাদের মূল আপত্তি এই যে তাদের তত্ত্বকাঠামোটাতে তৃতীয় বিশ্ব আগাগোড়া অনুপস্থিত। গ্রামশির হেজেমনি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের যে একটা নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে এটা লামু ধরতেই পারেননি। গ্রামশির হেজেমনি-আলোচনার একটা এলাকা যে পুঁজি-প্রাকপুঁজি পারস্পরিকতা, ক্যাপিটাল-প্রিক্যাপিটাল ইন্টারকোর্স, এটা তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। গ্রামশি তার চিত্রনাট্য ফেঁদেছিলেন একটা আনকোরা চরিত্রকে ঘিরে — পরোক্ষ বিপ্লব, প্যাসিভ রেভলিউশন — যা, বলা যায়, হেজেমনির যাবতীয় ধারণাকে এক কথায় প্রকাশ করে। এই পরোক্ষ বিপ্লবই আমাদের গ্রামশিপাঠের বিসমিল্লা। গ্রামশির এই প্যাসিভ রেভলিউশানের সমালোচনার মাধ্যমে এর একটা নতুন ভাষ্য খাড়া করতে চাই আমরা, যার নাম দেব প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশন, পরোক্ষ পুনর্পরিমাপ। শুধু সমালোচনা না, গ্রামশির পরোক্ষ বিপ্লবকে আমরা টেনে আনতে চাই পোস্টমডার্ন পরিপ্রেক্ষিতে। তাকে নতুন পরিবেশে নতুন করে বিচার করতে চাই। আমরা লামুর হেজেমনি এবং অ্যান্টাগনিজম (নিয়ন্ত্রণ এবং বিরোধ) এই দুটো ধারণাকে এবার ওয়াচ করব, জেরা করব। লাকাঁর সিম্পটম-ধারণার যন্ত্রপাতি দিয়ে কাটাকুটি করব। যাতে লামুর এই তত্ত্বের প্রসার ও সীমাগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এই প্রবন্ধের প্রসার এটুকুই, সম্পৃক্ত অন্য আলোচনা অন্যত্র।

গ্রামশির বিরুদ্ধে লামুর আর আমাদের একই নালিশ — এসেনশিয়ালিজম। লামুর আলোচনাকে এখানে কাজে লাগানো যাক। পোস্টমডার্ন তথা পোস্টকলোনিয়াল, উত্তর-আধুনিক তথা উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির বিচারে লামুর মূল দুটো অস্ত্র : অ্যান্টাগনিজম এবং হেজেমনি, বিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ। বিরোধ বা অ্যান্টাগনিজম একটা উত্তর-আধুনিক বাস্তবতার সীমা বা লিমিটকে চিহ্নিত করে। আর নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি দেখায় ক্ষমতা (পাওয়ার) কী ভাবে সেই সীমাকে আত্মস্থ করে, সমাপ্ত করে, ক্লোজ করে।

২।। হেগেল দিয়ে গ্রামশি পড়া

পরোক্ষ বিপ্লবের চালু ভাষ্যগুলোর প্রত্যেকটাই নির্মিত হয়েছে হেগেলীয় দর্শনের বর্গগুলোর ভিত্তিতে। তাই হেগেলের যুক্তিনির্মাণের সঙ্গে একটু চেনাশোনা হওয়ার দরকার। হেগেলের পুরো দর্শনটা একটা হোল বা সমগ্র-র ধারণার চারপাশে ঘুরছে। যে সমগ্র তার অংশগুলোকে ধারণ করে আবশ্যিক বা নেসেসারি রকমে। অন্য আর এক রকম সমগ্রে এই সম্পর্কটা হতে পারত আপতিক বা কন্টিজেন্ট। যেমন, সমাজ একটা আবশ্যিক সমগ্র, আর যাত্রীবাহী বাস একটা আপতিক সমগ্র। সমাজের অংশ হওয়াটা আবশ্যিক। কিন্তু যাত্রীবাহী বাসের যৌথতায় কেউ কখনো থাকতেই পারে, না-থাকতেই পারে। এই সমগ্র এবং অংশের সমান্তরাল অন্য দুটি ধারণা — ইউনিভার্সাল এবং পার্টিকুলার, সর্বব্যাপী এবং বিশেষ। এরা, সেই অর্থে, যথাক্রমে, সমগ্র এবং অংশ-র প্রতিনিধি। যেমন

হেগেলের 'ফিলোসফি অফ রাইট'-এ অ্যাবস্ট্রাক্ট রাইট বা বিমূর্ত অধিকার-এর ধারণা হল সেই সর্বব্যাপী (ইউনিভার্সাল) যা হোলের (সমগ্রের) অংশ, সমগ্রের প্রতিনিধি স্থানীয় একটা অনুষঙ্গ। বিমূর্ত অধিকার হল তাই যা সবার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর একক ব্যক্তির জন্যে থাকে ব্যক্তি অধিকারবোধ, মানে তাই যাকে বহন করে বিশেষ বা পার্টিকুলার।

হেগেলের যুক্তিবিজ্ঞানে, লজিকে, বিপরীতদের ঐক্য এবং সংগ্রাম, ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অফ অপোজিটস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পার্টিকুলাররা হল সেই পরস্পর সংগ্রামরত বিপরীত। যেখানে তারা বিচরণ করে সেই সিভিল সোসাইটি একরকমের কিলিং ফিল্ডস — প্রত্যেকে তারা অন্য প্রত্যেককে বাধা দেয়, লড়াই করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা এই বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তি হিশেবে তাদের কোনো মিলনভূমি নেই, কোনো সাধারনতা কোনো মিলই নেই তাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের (হবসের কথা মনে পড়ছে?)। একজনের অধিকার অন্যের অধিকারের সঙ্গে লড়াই করে।

বিমলের প্রোজেক্ট রিপোর্ট অমল নিজের নামে চালিয়ে দেয়, কমল আবার নিজের বাড়ির বেড়া বাড়িয়ে চলে অমলের জমি খেয়ে। এরকম সব কালেক্টিভ ক্যালাকেলির পরে, হত্যাকরাকরি সাঙ্গ হলে মর্গে তাদের হৃদয় জুড়োলো, তারা ইন্দ্রজিতকে কে খাড়া করলো, তাদের সবচেয়ে বড় বীর ইন্দ্রও যার কাছে বিজিত, একটা সর্বব্যাপী সাধারন নীতি, অ্যাবস্ট্রাক্ট মরালিটি প্রিন্সিপল, বিমল বিমলের রিপোর্টের মালিক, অমল তার জমির, কমল তার হুঁকো-কলকের। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির মালিক, অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেকেরই মালিক সম্পত্তি নামক ধারণা, সম্পত্তিনেস। গোঁফের আমি গোঁফের তুমি — অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই গোঁফনেসের, গোঁফত্বের। আমার গোঁফ যদি থাকে, আবার তোমার গোঁফও যদি থাকে, আর থাকবে তো বটেই, তুমি থাকবে অথচ তোমার গোঁফ থাকবেনা তা কী করে হয়, তাহলে আমার গোঁফের ভিতরেই একটা গোঁফত্বের সীমাও রয়ে গেছে, যার পরে আমার গোঁফ আর নেই, তা রপর থেকে আদিগন্ত শুধু তোমার গোঁফ। গোঁফ থাকা মানেই গোঁফের সীমাও থাকা। আমি যদি চাই আমার গোঁফ তুমি ছেঁটে দেবেনা, তাহলে তোমার গোঁফের দিকে আমিও কাঁচি তাক করতে পারব না। পার্লামেন্টের মাথায় মাথায় টাঙানো হবে গোঁফত্বের পতাকা, কেউ আমরা আর অবমাননা করতে পারবনা, জাতির, সংবিধানের, গোঁফনেসের। এই গোঁফনেস বা অ্যাবস্ট্রাক্ট মরালিটি প্রিন্সিপলই তৈরি করল সাধারনত্ব — ওয়াননেস — যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে, প্রত্যেকে আমরা সেই পতাকা দেখে সেলাম ঠুকতে বাধ্য।

এই সর্বব্যাপী, ইউনিভার্সাল — সম্পত্তিবোধ এবং সম্পত্তিনীতি — একে বহন করে সবাই। এটাই তাদের মিলনভূমি। এটাই সেই মূল যেখান থেকে প্রবাহিত হয় প্রতিটি ব্যক্তি-সম্পত্তি, বিশেষ, পার্টিকুলার। তাই পরস্পর সংগ্রামরত এই পার্টিকুলারদের বিভিন্ন পার্টিকে কুল ডাউন করে, তাদের ঐক্য রচনা করে ইউনিভার্সাল। মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এর একটা হেগেলীয় পাঠের কথাই ধরা যাক। মজুরি-শ্রম এবং পুঁজি-র নিতান্তই আড়ি, চরম শত্রুতা, কিন্তু তাই বলে 'হে বন্ধু বিদায়' 'বলে তারা দুজনে দুজনকে ছেড়ে তো চলে যায় না। বরং তারা দুজনে মিলে, তা সে যত নড়বড়েই হোক না কেন, একধরনের একটা মহাজোটও তৈরি করে। কারণ, তারা দুজনেই, হেগেল মোতাবেক, একই ইউনিভার্সালের শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে — পণ্যতন্ত্র বা কোমোডোটি প্রিন্সিপল সেই ইউনিভার্সাল। পুঁজি ও মজুরি-শ্রম তাদের নিজেদের ডাই-হার্ড-উইথ-এ-ভেনজিয়ান্স শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে আলিঙ্গনে আশ্লেষে জমাট দ্রবীভূত এক : *দেখো — তুমি আর আমি কেমন এক হয়ে গেছি*। কোমোডোটি প্রিন্সিপলের বিছানায় তারা এখন স্লিপিং-উইথ-দি-এনিমি। তাদের এই নাটকীয় মিলনটা ঘটে বাজারে, শ্রমশক্তি নামক পণ্য কেনা বেচার বাজারে আকার পায় এই আশনাই, আঁখিয়া মিলি তো মিলি তো বিচ বাজার, দিল মেরা লুট গয়ি পহলি বার।

হেগেলীয় টোটালিটিতে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সংগ্রাম (যেমন ওই পুঁজি আর শ্রমের ভিতর) প্রত্যক্ষ এবং আশু, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট। আর ঐক্যটা ঘটে মাধ্যম বাহিত হয়ে, ইউনিভার্সালের দ্বারা সংঘটিত। তাই হেগেলীয় টোটালিটির বৈশিষ্টঃ—

১) দুটি উপাদানকে পরস্পরের প্রতি বাইনারি বা দ্বিমুখী বিরোধে থাকতে হবে। মজুরি-শ্রম ও পুঁজি যেমন।

২) একটা উপাদানের এই হিম্মত থাকতে হবে (এক্ষেত্রে সেই ক্যালিটা মজুরি-শ্রমের) যাতে সে অন্যজনকে নাকচ করে দিতে পারে (ব্যক্তি পুঁজি) এবং তুলে নিয়ে যেতে পারে অস্তিত্বের একটা উচ্চতর অবস্থানে (ধরুন সামাজিক পুঁজি বা সম্মিলিত সম্পত্তি, কালেক্টিভ প্রপার্টি, সমাজতন্ত্রে যেমন) — যাকে এককথায় বলা যায় আরোহন, সুপারসেশন।

(আমাদের বাল্যকালে ফর্সা গাড়ি থেকে নামা ফর্সা কাপড় ফর্সা অন্তর্বাস পরা স্নানশুদ্ধ পুরুতেরা অঞ্জলির মন্তর পড়াতেন, ... *থিসিসকে অ্যানিহিলেট করে অ্যান্টিথিসিস ... নির্মিত হয় সিন্থেসিস ... এইভাবেই মানবসমাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে যায়* ... আর কোন শালার পাগলছাগলেরা, না ভুল বললাম, অ্যান্টি-পাগলেরা, অ্যান্টি-ছাগলেরা কোথায় জানি লিখেছিল না, হিউম্যানিটি অ্যাডভান্সেস ফ্রম ক্যাটাস্ট্রফি টু ক্যাটাস্ট্রফি ... ফ্রম ভায়োলেন্স টু মোর অ্যান্ড বিগার ভায়োলেন্স ...?)

সরি, হেগেলের এই সমগ্র-ধারণা আমরা মানিনা। বা মানিনা এর অন্য সংস্করণটিকেও, যেখানে ধরা হয়, ইউনিভার্সাল আপনা থেকে গজালো না তো *নো প্রোবলেমো*, সারোগেট বা ক্ষেত্রজ ইউনিভার্সাল তৈরি হবে, আর তার আধারে ডাউনলোড হবে যাবতীয় সব সারোগেট ঐক্য। (পুরাণে আছে, যখন ডিফল্ট পদ্ধতিতে, মানে নিজস্বামীসঙ্গমে যখন গর্ভ ঘটত না, অন্য পুরুষের উর্বর ঔরস দেওয়ানো হত, প্রোডাক্টটার নাম হত 'ক্ষেত্রজ'। সারোগেট মা যেমন অন্যের ভ্রূণকে নিজের জরায়ু ধার দেয়। এই সারোগেট ইউনিভার্সালকে 'কানাইজননী' ইউনিভার্সালও বলা যায়, কানাই-এর মা তো তাকে বিয়োয়নি।) এই দুটোর জায়গায় আমরা আনতে চাই আমাদের সমগ্র-ধারণা, যেখানে কোনো ধরনের কোনো বাইনারি দ্বন্দ্ব নেই, তাই ইউনিভার্সাল বাহিত কোনো কুলীন বা বর্ণসঙ্কর ঐক্যের প্রশ্নও নেই, থিসিস-অ্যান্টিথিসিস অতিক্রমণ (সুপারসেশন) নেই, আছে অতিনির্ণয় (ওভারডিটারমিনেশন) — দ্বিমুখী নয়, বহুমুখী সম্পর্ক। হেগেলের টোটালিটির ভিতর একটা ইতিহাসবাদ নিহিত আছে, ইতিহাসের একটা গতিমুখ। অতিক্রমণ বা সুপারসেশন মানেই একটা ক্রমোন্নয়ণ। এককথায়, হেগেলীয় সমগ্র মানেই একটা সুনির্দিষ্ট ধারণার জগত, যেখানে অনৈতিহাসিক এলোমেলোপনার কোনো সিনই নেই। স্পষ্ট একটা আরব্ধ আছে, সেখানে পৌঁছনোর একটা নির্দিষ্ট গতিমুখ এবং গতিবিজ্ঞান আছে। সাতটার পরে আটটার পরে নটা। সকাল সাতটার সঙ্গে রাত্তির বারোটাকে মিশিয়ে সেখানে কবিতা লেখা যায়না।

কিন্তু ভুলে যাবেননা, হেগেলের টোটালিটি একটা দ্বান্দ্বিক, ডায়ালেকটিকাল টোটালিটি। এই সমগ্রের ইউনিভার্সাল একটা দ্বন্দ্বপ্রবণ, কন্ট্রাডিক্টরি ইউনিভার্সাল। যে ইউনিভার্সাল ক্রমে ইউনিভার্সাল হয়ে ওঠে ইতিহাস বেয়ে, ঐতিহাসিক সময়ে বিধৃত তার পরপর ধারাবাহিক মুহূর্তগুলো অতিক্রম করতে করতে। নিম্নতর থেকে উচ্চতর মুহূর্তে বিকশিত হতে হতে একসময় সেই ইউনিভার্সাল পৌঁছয় তার পথপ্রান্তে, টার্মিনাসে — আদর করে হেগেল যাকে ডাকলেন 'ইতিহাসের সমাপ্তি'। একটা শেষ দেখে ছাড়ার সংস্কার এমন ভাবে চিরকাল তাড়িয়ে বেড়িয়েছে দার্শনিকদের। মার্ক্সও পৌঁছতে চেয়েছিলেন তার স্বপ্নের সব-পেয়েছির-দেশ কমিউনিজমে। 'এন্ড অফ হিস্ট্রি'-র হেগেলীয় দর্শনের টেকনিকাল নাম 'আইডিয়া' — সেই অবস্থা যখন সমাজ বাস্তবতা তার জার্নির শেষে তার আইডিয়ালে পৌঁছে সারা পথের ক্লান্তি আর সারা দিনের তৃষা অপনোদন করার আগেই বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, আর কোথাও তার যাওয়ার নেই।

হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি অফ স্পিরিট' চিহ্নিত করে বিকাশমান এই ইউনিভার্সালের পত্রমোচি মুহূর্তগুলোকে। মানুষের আদিম ক্যালাকেলি (বা ক্যালাকেলিহীনতা) এবং তার ক্রমবিকাশ। আর 'ফিলোজফি অফ রাইট' দেখায় কী ভাবে এই ইউনিভার্সাল (অধিকার, আইন, স্বাধীনতা) একক ব্যক্তি নাগরিকের হৃদয়ে হৃদয়ে বহমান তার সর্বব্যাপিতায় পৌঁছলো। প্রথমে আবিষ্কৃত হল সম্পত্তি নামক ধারণা, সম্পত্তির সীমা-র ধারণা, এই ধারণাগুলোকে লিপিবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য সংবিধান তথা আইনব্যবস্থা, তারপর পুলিশ এবং মিলিটারি এই ব্যবস্থার প্রতিরক্ষায়। এই হেগেলীয় কাঠামোয়, খেয়াল করুন, খেয়াল করে পড়ুন, এদিক ওদিক তাকাবেন না, এই হেগেলীয় কাঠামোয় নেশন স্টেট নাগরিকের থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রতিটি সিটিজেনই এক একটি নেশন, নেশনকে বয়ে নিয়ে চলেছে তার পাঁজরের ভিতরে। তার সম্পত্তির প্রতি তার ভালোবাসা হয়ে

দাঁড়িয়েছে অ্যাজ এ হোল সম্পত্তিধারণা সম্পত্তিবোধের প্রতি ভালোবাসা। তার বুকের ভিতরেই তার নেশন, কৃষ্ণ যেমন মুখ হাঁ করে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিল। এই ইউনিভার্সালের গোমুখ থেকে ভেসে আসছে সর্বব্যাপী ঐক্য — হেগেল যেমন ভেবে নিয়েছিলেন তার সময়ের প্রাশাকে, শাসকের শাসন যখন শাসিতের অন্তঃস্থল অব্দি চারিয়ে যায় — তুমি হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকো, দেখতে তোমায় পাইনি গো তাই। মুখ লজ্জায় রাঙা করে, কাজলকালো চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়ে, রাষ্ট্র তখন ব্যক্তিকে বলেছিল, হাম আপকে দিলমে রহতে হ্যায়। এবং এই ইউনিভার্সাল কিন্তু আচমকা আলপটকা একটা ঘটে যাওয়া কিছু নয়। অন্য কিছু তো ঘটে গেলেই ঘটে যেতে পারত, নেহাত এটা ঘটল বলে — এরকমটা কিন্তু কদাচ নয়, কিছুতেই নয়, সেটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন হেগেল। এই ইউনিভার্সাল সর্বতোভাবেই না-অ্যাক্সিডেন্টাল। ইতিহাস দ্বারা পূর্বনির্দ্ধারিত এই ইউনিভার্সালই বানিয়ে তুলছে হেগেলীয় সমাজের শিক্ষিত ভদ্দরলোকের পাড়া, সুধী সমাজ, সিভিল সোসাইটি। নাগরিক মানে যে এই রাষ্ট্রকে চেনে জানে বহন করে।

হেগেলের ইউনিভার্সাল নিজেকে মূর্ত করে তোলে এই নেশন স্টেটে। ইউনিভার্সালের এবং পার্টিকুলারের এ এক ত্রুটিহীন সঙ্গত, বা, বলা যায়, রাষ্ট্র এবং সুধী সমাজের। রুশো, বেচারা রোমান্টিক, ভেবেছিলেন, ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি বাট এভরিহোয়ার ইন চেইনস, আমরা জন্মাই স্বাধীন, বাঁচি পরাধীন। হেগেলীয় রাষ্ট্রধারণা তার জাস্ট উল্টোটা। সুধী সমাজের ভদ্দরলোক নাগরিকরা তাদের স্বাধীনতাটাই পায় রাষ্ট্রের সুধী সমাজের আশ্রয়ে। জঙ্গলরাজ মাৎস্যন্যায়ের আদিম ক্যালাকেলি থেকে বাইরে দাঁড়ানোর ঠাঁইটা তাকে দেয়ই এই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই তার অধিকার বোধের এবং অধিকার কায়েমের হাতিয়ার।

মার্ক্সের, বা, সেই অর্থে গ্রামশির, কোনো হেগেলীয় পাঠ কিন্তু এর সঙ্গে যায় না। সেখানে একটা অনতিক্রমণীয় দূরত্বের কথা বলা হয়, রাষ্ট্র এবং সুধী সমাজ, স্টেট এবং সিভিল সোসাইটির অভ্যন্তরে। একটা অনুপশমনীয় বৈপরীত্য। সেখানে পার্টিকুলাররা (সুধী সমাজের নাগরিকরা) বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, ছিটিয়ে যায়। রাষ্ট্র তাদের আর সামাল দিতে পারে না। এক অর্থে, হেগেল দিয়ে মার্ক্স পড়তে গেলে আদর্শ রাষ্ট্রের হেগেলীয় ধারণাটাই ভোগে চলে যায়। রাষ্ট্র আর সুধী সমাজের এই মেড ফর ইচ আদার সম্পর্কটাকেই মার্ক্সে জেরা করা হয়। বড় হয়ে ওঠে নিপীড়ক রাষ্ট্র, অপ্রেসিভ স্টেট-এর ধারণা। যে নিপীড়ক রাষ্ট্র তার সুধী সমাজকে ধারন করে তোষণ এবং দমন, পারসুয়েশন এবং কোয়েরশনের মাধ্যমে। যদিও হেগেলের সমাজকাঠামোর মার্ক্সীয় পুনর্গঠন, হেগেলের যুক্তি-নির্মাণকে, লজিককে, তাই তার আভ্যন্তরীন ইতিহাসবাদ, হিস্টরিসিজমের ধারণাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো জায়গায় মেজর কোনো জেরা করেনা। অনেকটাই মেনে নেয়। দ্বান্দ্বিক সর্বব্যাপী, কন্ট্রাডিক্টরি ইউনিভার্সাল-এর ধারণাকে রেখে দেয়, তার নিম্নতর মুহূর্তকে অতিক্রম করে যাওয়া উচ্চতর মুহূর্তের ভিতর দিয়ে বহমান ইতিহাসের ক্রম-অনুসারী বোধকেও। যে নিম্নতর মুহূর্তগুলোকে ডাকা হয় থিসিস এবং অ্যান্টি-থিসিস বলে। আর তাদের সমণ্বয় অর্থাৎ অতিক্রমণ-কে, সুপারসেসনকে ডাকা হয় সিন্থেসিস বলে।

হেগেলীয় পার্টিকুলারদের ধারা অনুযায়ী, এই থিসিস অ্যান্টিথিসিস গুলোও নিজেদের ভিতর লড়ে যায়, ঈগল গ্যাং আর বিচ্ছু গ্যাং এর শাহরুখ আর শরদ কাপুর এর মত, কৌন হারা কৌন জিতা এই মরণপণ সংগ্রাম। তার মধ্যে দিয়ে, মাঝখান থেকে, ইমার্জ করে যায় হিরো চন্দ্রচূড় হিরোইন ঐশ্বর্য। সংশ্লেষের উচ্চতর মুহূর্ত, হায়ার মোমেন্ট অফ সিন্থেসিস। নিম্নতর মুহূর্তগুলোকে হাপিস করে দেয়, কিন্তু চেশায়ার বিল্লীর হাসিটুকু রয়ে যায়, নিম্নতর মুহূর্তগুলোর ইতিহাস এবং আত্মা। চন্দ্রচূড় শরদ কপুরের ভাই, তাই একটু একটু শরদ কাপুর, আর ঐশ্বর্যর তো কথাই নেই, সে শাহরুখের যমজ।

চালু মার্ক্সবাদী ঘরানাগুলোয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দাঁড়িয়ে আছে এই হেগেলীয় তেপয়ার উপর — থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিন্থেসিস। যেখানে সমস্ত ঘটন-অঘটন, সমস্ত মারামারি-কাটাকাটির ভিতর গভীর গোপনে বয়ে চলেছে ওই ইতিহাসবাদের ফল্গু। নিয়ত বহমান ক্রম-উন্নতিশীল এসেন্সের একটি ধারা, ধেয়ে চলেছে একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে — হেগেলের মডার্নিজম, বা, পরে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর কমিউনিজম। একই সারবাদী, এসেনশিয়ালিস্ট প্রচ্ছন্ন স্বর, একই সরগম একই রাগরূপ কাজ করে চলেছে : তাদের আলাপ বা বিস্তার যতই

আলাদা হোক। পরপর নানা '-তন্ত্র' নানা '-ইজম' এর শোভাযাত্রায় (ফিউডালিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশালিজম — সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র) আকার পেয়ে ওঠে একই ইতিহাসের গতিমুখের ধারণা, যেখানে নিম্নতর মুহূর্তগুলোকে অতিক্রমণ করে উচ্চতর মুহূর্তেরা। গতিমুখের তীরচিহ্নটা এই জায়গায়, নিম্ন→উচ্চ, এবং অতিক্রমণ মানেই আগে→পরে। যা অতিক্রম করে যায় তা পরে, অর্থাৎ, রইল, উচ্চতর মুহূর্ত। এবং যা অতিক্রান্ত হয় তা আগে, অর্থাৎ, ছিল, নিম্নতর মুহূর্ত।

হেগেলের লজিক কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কড়াইয়ে একটা স্পষ্ট রূপান্তরও পেলো। এখানে আমরা ইউনিভার্সালকে পেলাম দুটো অক্ষ বরাবর। সময়-অক্ষ এবং ভূমি-অক্ষ, টাইম-অ্যাক্সিস এবং স্পেস-অ্যাক্সিস। ইউনিভার্সালের পরিবর্তনের গতিপথে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো অক্ষ সৃষ্টি হয়ে গেল। একটা ভূমি অক্ষ এবং অন্যটা সময়-অক্ষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো নিরিখে এবার আমরা বিচার করছি একই ইউনিভার্সালকে। যেরকম দুটো অক্ষকে নিয়ে স্কুল বীজগণিতের সমীকরণগুলো আঁকা হয়। ভূমি অক্ষের প্রসার বলতে এখানে সমাজ বাস্তবতাটাকে ভাবুন, ইউনিভার্সাল জুড়ে চতুর্দিকে যা ছড়িয়ে আছে সেইসব সামাজিক উপাদানেরা। সেখানে মালিক আছে, শ্রমিক আছে, জমিদার আছে, জমিদারের বন্ডেড লেবার মানে মুনিষ আছে, দোকান আছে, ইস্কুল আছে, খেলা আছে, ম্যাচ ফিক্সিং আছে, খুন আছে, প্রেম আছে। আর সময় অক্ষ বলতে ভাবুন ইতিহাসের একমুখী গতির সমান্তরালে ইউনিভার্সালের সময়-বরাবর বিবর্তনকে। ইউনিভার্সালের বদলটা ঘটছে দুটো অক্ষের নিরিখেই। সময় অক্ষ বরাবর ঘটছে একটা অতিক্রমণ। আগেরটা, অর্থাৎ পুরোনোটা, মানে সামন্ততন্ত্রকে অতিক্রম করে যাচ্ছে পরেরটা, নতুনটা, মানে পুঁজিতন্ত্র। পুরোনো সামন্ততন্ত্র থেকে ক্রমগজায়মান ভ্রূণ-পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরের কথা ভাবুন — দুটো মুহূর্তের ভিতর ক্লিয়ার একটা ক্রমান্বয় আছে, আগেরটা সামন্ততন্ত্রটা থিসিস এবং পরেরটা পুঁজিতন্ত্রটা অ্যান্টিথিসিস। তারপর, সমস্ত কেলো ও কিচাইনের শেষে, শিশির-শব্দী শান্ত সন্ধ্যায়, যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের পর, যখন এঁড়ে পুঁজিতন্ত্র (এঁড়ে, নাকি, বকনা?) বেশ গায়েগতরে হয়েছে, পুরুষ্টু এবং সোমত্থ পূর্ণ পুঁজিতন্ত্র, সিন্থেসিস, তখন সে কিন্তু ইতিমধ্যেই হাপিস করে দিয়েছে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস, মানে সামন্ততন্ত্র আর ভ্রূণ-পুঁজিতন্ত্র দুটোকেই। অ্যাকচুয়ালি তাদের দুটোকেই তুলে নিয়ে গেছে অস্তিত্বের একটা উচ্চতর মার্গে।

কিন্তু, এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ, খেয়াল করে পড়ুন, ('এন্টার' মেরে নতুন প্যারা করলাম শুধু এই বাড়তি গুরুত্বটাকে বোঝাতে, নইলে কেউ 'কিন্তু' দিয়ে বাক্য শুরু করে, প্যারা তো দূরের কথা?) ভূমি অক্ষ বরাবর সামন্ততন্ত্র আর এঁড়ে-পুঁজিতন্ত্র দুটোই কিন্তু সর্বব্যাপী ইউনিভার্সাল হিশেবে রয়ে যাচ্ছে, যাদের বিশেষ পার্টিকুলাররা হল, প্রথমটার ক্ষেত্রে জমিদার-মুনিষ, আর দ্বিতীয়টার মালিক-শ্রমিক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের চিরাচরিত অবস্থান মানেই সব আলোচনা ফোকাসিত নিবদ্ধ সময়ের গতিমুখে, সময়-অক্ষে, থিসিস-অ্যান্টিথিসিস সময়গত অতিক্রমণে, আর কোনো কন্ট্রাডিকশন, কোনো দ্বন্দ্ব কোনো ঘাপলা কেহ নাই কিছু নাই গো, ভূমি অক্ষ বরাবর যে অজস্র অবিরল দ্বন্দ্ব এবং কেলো সেদিকে আর কোনো খেয়ালই নেই। মার্ক্সবাদের এই অবস্থানে কন্ট্রাডিকশন-এর, দ্বন্দ্বের সংখ্যা মাত্র এক — বাইনারি দ্বন্দ্ব — থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস এই দুইয়ের অভ্যন্তরে। অথচ অন্য অক্ষটাকে মানে ভূমি অক্ষটাকে সঙ্গে নিন, দুটো অক্ষকে মিলিয়ে একত্রে ভাবুন, কত কিছু ঘটছে চতুর্দিকে। সেটা কিন্তু এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ বিস্মৃত রইল। আমরাও আপাতত এই নানা অক্ষে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের অবিরত সাইকেল-চালনাকে ভুলে থাকি, আসুন, গ্রামশির পরোক্ষ বিপ্লবের ধারণায় এই হেগেলীয় লজিক ঠিক কী কী ভাবে বদলে গেছিল সেটা বোঝার স্বার্থে।

হেগেলের মূল ভাবনাটাকে কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই বদলে ফেলেছি। হেগেল সময় অক্ষকে ভূমি অক্ষ থেকে আলাদা করে ভাবেননি। তার কাছে পুরো বদলটাই ছিল সময় বরাবর বদল। হেগেলের কাছে পুরোটাই এইরকম : সময় বদলায়, তার সঙ্গে সমাজ কাঠামো বিবর্তিত হতে থাকে, তার নিজের গতিতেই পুরোনোটা বদলে নতুনটা আসে, ক্রমে, ধীরে, কিন্তু অনিবার্যভাবে। আমরা সেই সময়বরাবর বদলের অনিবার্যতাটাকে নষ্ট করে দিলাম। এখন 'পুরোনো' আর 'নতুন' দুটোই পাশাপাশি, একই সময়ে অবস্থান করছে — জাস্ট দু কিসিমের দুটো উপাদান তারা — দুই পিস আলাদা আলাদা ইউনিভার্সাল — দুটো আলাদা কাঠামো। তাদের নিজের নিজের পার্টিকুলাররাও

আলাদা আলাদা দুটো সেট। সবাই ছড়িয়ে আছে চারপাশে, সমাজ বাস্তবতায়। বিবর্তনের সময়মুখটা এখন আর অনিবার্য বা অমোঘ কিছু নয়।

হেগেলের লজিকের সময়-অক্ষ বরাবর ইউনিভার্সালের ধারণাকে বদলে সময়ের গতিমুখ বরাবর বিভিন্ন মুহূর্ত অনুযায়ী ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকা ইউনিভার্সালের আকার হিশেবে ভাবার একটা অর্থ হল হেগেলের পার্টিকুলার-ধারণাকেও বদলে ফেলা। পার্টিকুলারদের নিজেদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও এবার একটা বৈচিত্র তৈরি হল। এতক্ষণ পার্টিকুলারদের আভ্যন্তরীন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মাত্র একটা রকমেরই ছিল। বাইনারি বৈপরীত্য — যখন দুই বিপরীত পার্টিকুলারের সমস্ত শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের দুজনেরই অস্তিত্ব একই সূত্রে গ্রথিত — একজন অন্যজনকে ছাড়া বাঁচতেই পারেনা। যেমন, পুঁজি এবং মজুরি শ্রম। এখন, এই বাইনারি দ্বন্দ্ব ছাড়াও আরো একটা দ্বন্দ্ব খেলা করছে পার্টিকুলারদের জগতে। পার্টিকুলাররা আর শুধুমাত্র তাদের বাইনারি বৈপরীত্যেই নেই, আর একরকমের দ্বন্দ্বও এসে গেছে সিনে, কিছু পার্টিকুলার হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর-ব্যাতিরেকী, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, একজনের থাকা মানেই অন্যজনের না-থাকা। আমাদের উদাহরণের সামন্ততন্ত্র আর স্ফূরণশীল পুঁজিতন্ত্রের কথাই ধরুন, এদের এবার সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট কর্তিত সেপারেট দুটো সত্ত্বা হিশেবে ধরা যেতে পারে। পুঁজি তার বিপরীত মজুরি-শ্রমকে অপনোদন করার ক্ষমতা রাখেনা, কারণ তার মানেই নিজেকেও অনস্তিত্ব করে দেওয়া, হত্যা মানেই আত্মহত্যা, কিন্তু সামন্ততন্ত্রকে তো আলবৎ পারে, 'জমিদার'-শ্রেণীটাকে, নিজেকে কোনো ব্যথা না দিয়েই। তাই, 'মজুরি শ্রম' আর 'জমিদার/মুনিষ' এই দুটোকেই যদি পুঁজির অপর বলে ধরা হয়, পুঁজিতন্ত্রের সাপেক্ষে এই দুই অপরের দুটো আলাদা ভূমিকা। মজুরি শ্রম পুঁজির আভ্যন্তরীন অপর, ইন্টারনাল আদার। এটা একটা বাইনারি দ্বন্দ্ব, যেখানে বিপরীত দুই পক্ষকে পরস্পরের থেকে কর্তিত করা যায়না। আর জমিদার/মুনিষ তার বহিরাঙ্গিক অপর, এক্সটারনাল আদার। এখানে দ্বন্দ্বটা আসে বাইরে থেকে। গ্রামশির পরোক্ষ বিপ্লবের তত্ত্ব বুঝতে এই পয়েন্টটা আমাদের প্রয়োজন পড়বে।

গ্রামশির এই তত্ত্ব হেগেলের অতিক্রমণ, সুপারসেশনের ধারণাকে প্রশ্ন করে, এই বিশ্বাসটাকে যে ইতিহাসের নিম্নতর মুহূর্তগুলো একই সাথে অপনোদিত এবং সংরক্ষিত হয় উচ্চতর মুহূর্তগুলোর মাধ্যমে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গোঁড়া রক্ষণশীল টোলগুলোয় ধরে নেওয়া হয়, সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীন গতিশীলতার গোলযোগে গজিয়ে উঠতে থাকে পুঁজিতন্ত্র, বেড়ে উঠতে থাকে, সমুদ্দুরের গহিন জলে পিতৃস্নেহপরবশ ক্যাটফিশের ভ্যাটকানো মুখে হাঁ-করা চোয়ালের ভিতর, ওই ভ্যাটকানো মুখ আর কোনোদিন নরমাল হবেনা, কিলবিল করে নয়া জেনারেশন ক্যাটফিশেরা, বাবার মুখের ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকা, ক্রমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে উবে যাবে বাবা ক্যাটফিশ, বেবি ক্যাটফিশেদের কুচি কুচি দাঁতে সমস্ত মাংস কাঁচিয়ে নেওয়ার পর বিশুষ্ক স্লো-মোশান কঙ্কাল টাল খেতে খেতে ঠাঁই পাবে মহীসোপানে। রেমন্যান্ট, নিতান্তই রেমন্যান্ট তারা, দেহাবশেষ, অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত, কেজো সমাজবিজ্ঞানী যাকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারেন। বাবা ক্যাটফিশের মুখের ভিতর মা ক্যাটফিশের পাড়া ডিম ফুটে ওঠার মুহূর্ত থেকে বেবি ক্যাটফিশ তার চতুর্পার্শ্বে দেখছে তাল তাল পিণ্ড পিণ্ড তখনো জ্যান্ত মাংসের খাদ্যের পাহাড়, খা খা শালা খা, খেয়ে খেয়ে নিকেশ করে দে। জয়টা, নেতৃত্বটা এখানে বেবি ক্যাটফিশের, পুঁজিতন্ত্রের, সেই শেষ কথা বলে। তখন বলার মত আর কেউ, কোনো প্রাক-পুঁজি, পিকচারেই থাকেনা আর। তারা সবাই তখন অনন্ত বিস্তৃত গভীর গোপন মহীসোপানের লয়হীন পরিচয়হীন নৈঃশব্দ্যে।

৩।। গ্রামশির অনুপ্রবেশ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনার ঠিক এইখানটাতেই গ্রামশির উর্বর অনুপ্রবেশ। গ্রামশির একটা হেগেলীয় পাঠ, বা, ধরুন কেন, হেগেলের একটা গ্রামশীয় পুর্ননির্মাণ জাস্ট এইটাই বলতে চাইবে যে পুঁজির দ্বারা প্রাক-পুঁজির এই অপসারণ একান্ত অবশ্যম্ভাবী এবং আবশ্যিক কিছু নয়। বরং, সিচুয়েশন অনুযায়ী, যদি সেটা সম্ভব হয়, পুঁজি প্রাকপুঁজিকে আত্মীকরণ-ও করে নিতে পারে, গিলে নিতে পারে, বেড়েই উঠতে পারে প্রাকপুঁজিকে খেয়ে। একটু জার্গন লড়িয়ে বলা যায়, থিসিস সদাসর্বদাই অ্যান্টিথিসিসকে অপসারণ করেনা, অ্যান্টিথিসিসের একটা অংশকে

আত্মীকরণ করে নির্মাণ করে একটা সারোগেট বা মায়া সিন্থেসিস। এই পরিস্থিতিটাকেই গ্রামশি ডেকেছেন 'প্যাসিভ রেভলিউশন', পরোক্ষ বিপ্লব নামে।

তাই, গ্রামশির এই হেগেলীয় পাঠে পরোক্ষ বিপ্লব এমন একটা অবস্থা যেখানে বুর্জোয়ারা (থিসিস) জমিদারদের (অ্যান্টিথিসিস) সঙ্গে কোনো সরাসরি মরণপণ দ্বৈরথে নামছে না। বরং প্রশমিত করছে, একটু আধটু তোল্লাই দিচ্ছে, বার খাওয়াচ্ছে কখনো সখনো, কিছু কিছু কেতা শিখেও নিচ্ছে — সব মিলিয়ে অধিকার করে নিচ্ছে : আত্মীকৃত করে নিচ্ছে। না, তার চেয়েও বেশি, বুর্জোয়ারা কখনো কখনো (মানে, প্রায়ই) জমিদারতন্ত্রকে নিজেদের আভ্যন্তরীন করে ফেলছে, অর্থাৎ, শুধু জমিদারদের নয়, জমিদার আর তার মুনিষ — গোটা কাঠামোটাকেই।

থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এই দুটোকে দুটো জট, কমপ্লেক্স বলে ভাবুন। থিসিস নামক জট অ্যান্টিথিসিস নামক জটকে তার আভ্যন্তরীন করে ফেলছে। পুঁজির জট নিজের ভিতর গিলে নিচ্ছে প্রাকপুঁজির জটটাকে, যার ভিতরকার দুটো উপাদান জমিদার এবং মুনিষ। হেভি ইন্টারেস্টিং সব জাটিল্য রয়েছে এই পরিস্থিতিটার ভিতর, এবং এর উপাদানগুলোর রয়েছে অজস্র বহুমুখী প্রবণতা। সবটা মিলিয়ে তৈরি হয় ওই পরোক্ষ বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্বতা।

ধরুন, ভারতের পরোক্ষ বিপ্লবের একটা বিবরন এরকম হতেই পারত — বুর্জোয়ারা জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আর সংগঠিত তো করছেই না, এমনকী কোনো প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় নেতৃত্বও দিচ্ছে না। কৃষকরা নিজেরাই, কখনো বা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে, জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বাংলা বাজারে কৃষক আর জমিদাররা যখন পরস্পর প্যাঁদাপেঁদি করে মরছে, কেউ কাউকে কম্প্রিহেনসিভলি খাল্‌লাশ করে উঠতে পারছেনা, ভগওয়ান কে পেয়ারে করে দিতে পারছে না, লড়াইটা চলছেই, থার্ড পার্টি বুর্জোয়ারা হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপ্রতিরোধ্য —'সিজার', সম্রাট। বীজ রোপণ করল কৃষকরা, কমিউনিস্টরা। আর তার ফল প্যাঁদাল বুর্জোয়ারা। কিন্তু গুরু মরালটা দেখো, গল্পের মরালটা রয়ে গেল একই — থিসিস (পুঁজি) তার রাইভাল অ্যান্টিথিসিসকে (প্রাকপুঁজি) সমস্তক্ষেত্রে সদাসর্বদা হত্যা করতে চায়না, হত্যা করেনা।

গ্রামশি এই অবস্থাটাকে চিহ্নিত করলেন 'স্থগিত দ্বন্দ্ব' 'ব্লক্‌ড ডায়ালেকটিক্স' বলে। ভারতীয় সমাজপদ্ধতিতে এর বাস্তব এম্পিরিকাল খুঁটিনাটি নিয়ে কূটকচালের মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না। শুধু এটুকুই লক্ষ্য করার — চিরাচরিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আভ্যন্তরীন হেগেলীয় যুক্তিকাঠামোয় ঠিক কী ভাবে অনুপ্রবেশ করছেন গ্রামশি। থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস এর পারস্পরিক একরৈখিক বাইনারি দ্বন্দ্বকে, তাই তাদের অতিক্রমণের মাধ্যমে সিন্থেসিস-এ পৌঁছে যাওয়ার ধারণাকে গ্রামশি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। তার হাতে থিসিস সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মাত্রা পেয়েছে, যে শুধুই রোয়াবি করেনা আর, অ্যান্টিথিসিসকে নিজের করে নেয়, আর এই ভাবে, সত্য শুদ্ধ সিন্থেসিস-এর সন্ধানে ডায়ালেকটিক্স-এর যাত্রাকে স্থগিত করে রাখে। কিন্তু, হায় আল্লা, ক্যাঁচালটা দেখুন, গ্রামশি ঠাকুরও কিন্তু থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস-এর বিচ্ছিন্ন স্পষ্ট স্বতন্ত্র আলাদা আলাদা অস্তিত্বকে একবারও প্রশ্ন করলেন না। তারা তাদের পুরোনো আকারেই রয়ে গেল।

কিন্তু, সে কোন মায়াবলে থিসিস নিজেকে একটুও না বদলে, নিজের তিলমাত্র অভিযোজনও না ঘটিয়ে, তার জাতশত্রু অ্যান্টিথিসিসকে নিজের অস্তিত্বের অন্তঃস্থল অব্দি ঢুকিয়ে আনে? শীতল পাটি পেতে বিন্নি ধানের খই খেতে দেয়? নিজে নিজের মতই থেকে গিয়ে এটা করবার মাত্র একটা পথই খোলা থাকে, আত্মীকরণটাকে ঘটতে দেওয়া অস্তিত্বের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা স্তরে — গাছপাকা না মেলায় কার্বাইডে পাকানো সংকর সংশ্লেষ বা সারোগেট সিন্থেসিস-এর তলে। গ্রামশির মতে, পুঁজিপতি শ্রেণী জমিদার শ্রেণীকে নিজের ভিতর ঢুকিয়ে আনে না, ঢুকিয়ে আনে নেশন-এর, রাষ্ট্রের ভিতর। আত্তীকরণটা ঘটায় নেশন দিয়ে। মাইক্রো নয় ম্যাক্রো স্তরে, ব্যষ্টি নয় সমষ্টি দিয়ে। কিন্তু মাইক্রো-স্তরে, ঘাসের শিকড়ে শিকড়ে, তৃণমূলে সিপিএমে কংগ্রেসে এসইউসিতে নকশালে, পুঁজিতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র কেউই নিজেদের কোনো গুণগত বদল ঘটায় না। একটু বাদেই আমরা আসছি উত্তর-উপনিবেশ পরিস্থিতির সাপেক্ষে গ্রামশির এই যুক্তিনির্মাণ নিয়ে আমাদের সমালোচনায়, যেখানে আমরা দেখাতে চাই, একদম তৃণমূল স্তরেও কী ভাবে পুঁজি আর প্রাক-পুঁজি দুটোই বদলে যাচ্ছে, তাদের পারস্পরিক অতিনির্ণয়ে।

থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিন্থেসিস। সম্রাট আলেকজান্ডারের মেজছেলের রাজত্বকাল থেকে এসব আমরা শুনে আসছি। এবার তারা সব মাইল্ড বদলে গেল। পূতপবিত্র শ্বেতশুভ্র সত্যশুদ্ধ সিন্থেসিসের জায়গায় এবার সংকর সংশ্লেষ, সারোগেট সিন্থেসিস। প্যাসিভ রেভলিউশনের পপুলার আখড়াগুলোর চালু কোস্তাকুস্তি সব এই নিয়েই — সিন্থেসিস না সারোগেট সিন্থেসিস — কেন কোথায় কখন কীভাবে?

ওসব ফাতরা ঝামেলায় যাওয়ার চেয়ে বরং আমরা এই পরোক্ষ বিপ্লবটাকেই কী ভাবে দেখতে চাইছি সেটা বলে নেওয়া যাক। পরোক্ষ বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমাদের নিট নতুন কথাটা ঠিক কী। মাইরি বলছি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, থিসিসের পক্ষে সরাসরি অ্যান্টিথিসিসকে নির্ণয় এবং নির্মাণ করা সত্যিই সম্ভব, এবং সম্ভব নিজেও অ্যান্টিথিসিস দ্বারা নির্ণীত এবং নির্মিত হওয়া, এবং নিজের আর অ্যান্টিথিসিসের শরীরে সেই অনুযায়ী বদল ঘটানো। কোনো সারোগেট ফারোগেট দিয়ে না, কোনো থার্ড পার্টি না, একদম সরাসরি প্রত্যক্ষ ডাইরেক্ট। এর জন্যে দরকার এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস পরস্পরের উপর সক্রিয়। অ্যান্টিথিসিস মানেই জাস্ট থিসিস-বিরোধিতা এমনটা নয় আর। অ্যান্টিথিসিস মানে অ্যান্টি—থিসিস এই সংজ্ঞাটায়, এইটুকুতে, আর চলছে না। আর কেলোটা দেখুন, এটুকু মেনে নেওয়া মানেই, উল্টোদিকে থিসিস-এর চিরাচরিত সংজ্ঞাটাও কেরোসিন হয়ে গেল। বাইনারি বৈপরীত্যটাই তো হাওয়া হয়ে গেছে, তাই দ্বন্দ্ব দিয়ে কাউকে আর বোঝার জো নেই। হায় বেচারা হেগেল, তার সাজানো বাগান ছারখারে গেল, সমস্ত দার্শনিক বর্গগুলোই নড়বড়ে এলোমেলো, তাদের অচল স্থিরতার শিকড় গেছে উপড়ে, সুস্থিত বৃক্ষ নয় আর তারা। হয়ে দাঁড়িয়েছে চলমান, পরিস্থিতি-নির্ভর, কন্টিজেন্ট। এমনকী অপরিহার্যও নয় আর, চাইলে ছেঁটেও ফেলা যায়।

আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প গ্রামশিপাঠ সম্ভব হয়ে ওঠে তবেই যদি আমরা এই আটকে যাওয়া পরিস্থিতিটাকে স্থগিত, ব্লক্ড ডায়ালেকটিক্স বলে না ভেবে হেগেলের ডায়ালেকটিক্স থেকে একটা রাস্তাবদল, ব্রেক বলে ভাবি। পুরো পরিস্থিতিটা আসলে একটা চরবদলের ডাক দিচ্ছে, আহ্বান করছে একটা বিকল্প তাত্ত্বীকরণকে, দ্বন্দ্ব নামক ধারণার একটা বিকল্প নির্মাণকে। যা গ্রামশির কাঠামোটাকেই নতুন করে গড়ে তুলবে আর একটা সদ্য আবিষ্কৃত জমিতে, যা আগেরটার মত এসেনশিয়ালিজমের অনড় স্থিরতার আর ইতিহাসবাদের ভারে ভারাক্রান্ত নয়, বদলাতে থাকা পৃথিবীর বয়ে আসা নতুন নতুন পলি জমে গজিয়ে ওঠা একটা নতুন চর, নন-ডিটারমিনিস্টিক, নন-হিস্টোরিসিস্ট।

গ্রামশির তত্ত্বের এই উত্তরহেগেলীয় পুর্ননির্মাণ কিন্তু খোদার উপর খোদকারি, একটা বেধড়ক ভাঙচুর। কারণ, গ্রামশির লেখার ছত্রে ছত্রে, তার শব্দচয়ণে, হেগেল চীৎকার করে উপস্থিত, প্রকাশ্যে, ততটা-প্রকাশ্যে নয়, এবং গোপনে গোপনে। গ্রামশির লেখা থেকে একটা অংশ অনুবাদ করা যাক (জয় তারা, গ্রামশি যদি বেঁচেও থাকতেন, বাংলা তো জানতেন না)।

> প্যাসিভ রেভলিউশনের পক্ষে এটা জরুরি যে থিসিস হয়ে উঠুক পূর্ণ-বিকশিত, এতদূর পূর্ণ যে অ্যান্টিথিসিসের একটা অংশকে নিজের করে নেওয়ার সাফল্যও সে অর্জন করে নিতে পারে — যাতে, বলা যায়, দ্বান্দ্বিক বিরোধে তাকে কেউ অতিক্রম করে গেল এই অবস্থার সঙ্গে যাতে তাকে (থিসিসকে)তাল মেলাতে না হয়। থিসিস আসলে নিজে নিজে বেড়ে ওঠে সেই অব্দি যেখানে সে এমনকি তথাকথিত অ্যান্টিথিসিসের প্রতিনিধিদেরও আত্তীকরণ করে নিতে পারে ঠিক এই জায়গাটাতেই থাকে প্যাসিভ রেভলিউশন বা রেভলিউশন/রি-ইটারেশন।

গ্রামশির ইতিহাসবাদের চিহ্ন রয়ে গেছে তার থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস, ফলতঃ পুঁজি এবং প্রাকপুঁজি এই শব্দ ব্যবহারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলথুসেরও গ্রামশির ইতিহাসবাদী ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন। মূল যে জায়গাটাকে আলথুসের চিহ্নিত করেছেন সেটা হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পুর্ননির্মাণে গ্রামশি লড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার পাশাপাশি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ডায়ালেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজমের পুর্নগঠনে কোনো এফর্টই দিচ্ছেন না। যা, আলথুসেরের মতে, থিসিস অ্যান্টিথিসিসের মত চিরাচরিত হেগেলীয় বর্গের হিমশৈলে জাহাজডুবি ঘটাতে বাধ্য। মেশিনের ফুয়েল আর ফিনিশড গুড দুটোই গেল বদলে, এদিকে পার্টস সেই মান্ধাতার বাবা যুবনাশ্বের আমলের। গ্রামশির যা প্রথমেই করা উচিত ছিল তা হল হেগেলের মূল মডেলটাকে খুলে ফেলা, পুরোটা, পিস বাই পিস, যদি

স্ক্রু জ্যাম হয়ে গিয়ে থাকে দরকার হলে হাতুড়ি দিয়ে। তাই বলা যায়, হেগেলের খিচুড়িতে পাক দিতে গিয়ে গ্রামশি তার তত্ত্বের তালাশটা যথেষ্ট দূর অব্দি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে করলেন না। হয়ে দাঁড়াল একটা আন্ডার-থিওরাইজেশনের, ন্যূন-তাত্ত্বীকরণের সমস্যা, যে সমস্যার মধ্যে হেগেলীয় ইতিহাসবাদের জলছাপগুলো রয়ে গেল।

থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস — দুই জল-অচল বর্গ, যাদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো দেওয়া-নেওয়া কোনো ওভারল্যাপ নেই — এই দুই ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেন্টে সোশাল-কে, সামাজিক-কে ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আলথুসের। আলথুসেরের ছকটা একদম ডিফারেন্ট। থিসিস সেখানে অ্যান্টিথিসিসের উপর প্রভাব ফেলে, নির্ণয় করে, এমনকী বানিয়েও তোলে। আবার অ্যান্টিথিসিসও একই জিনিষ করে থিসিসকে। দুজনেরই অতিরিক্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং, নিজের নিজের ডেকচি ছাপিয়ে উপচে পড়ে (দেরিদীয় ওভারফ্লো)। এমনি ওপচানো ওপচায় যে তাদের খোদ ওরিজিনাল অর্থগুলো আওয়ারা দিওয়ানা হয়ে দার-বে-দার ভটকতে থাকে, ম্যায় ম্যায় না রহা, তুম তুম না রহে, প্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা, অর্থাৎ, বাঁশীর করুণ ডাক বেয়ে ছেঁড়া ছাতা আর রাজছত্র দুজনেই নিজের নিজের নাম হারিয়ে চলে যায় নামহীনতার একই বৈকুণ্ঠের দিকে। ওই অতিরিক্ত অর্থেরা এবার আক্রমণ করে বর্গটাকেই। বর্গটার সংজ্ঞাগত অর্থের দিকচিহ্নগুলোকে জড়সে আখার দেয় তারা, উপড়ে ফেলে।

থিসিস অ্যান্টিথিসিস এই দুটো চিরাচরিত চেনা বর্গের কাম তামাম করে দেওয়ার পর আলথুসের এবার ঘেঁটে দিতে চাইলেন দ্বন্দ্ব, কন্ট্রাডিকশন নামের ধারণাটাকেই। সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট অনড়তার হেগেলীয় আলোচনার আরাম থেকে তাদের উৎখাত করতে চাইলেন। ওই একরৈখিক দ্বন্দ্বের জায়গায় আনলেন বহুরৈখিক দ্বন্দ্ব, যেখানে বর্গগুলো স্বশাসিত স্বনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় আর। তারা এক একটা ক্ষেত্র যেখানে কাজ করে চলে বহুমুখী বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব, নিজের নিজের গতিপথের চিহ্ন এঁকে যায় ওই বর্গ ছাড়াও অন্য বহু অজস্র বর্গ। পুরোনো হেগেলীয় নামগুলো ব্যবহার করলে বলা যায়, যেখানে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস দুজনেই পরস্পরকে অতিনির্ণয় করে। থিসিস-অ্যান্টিথিসিস ডায়ালেকটিক্স নয়, বা তার কোনো 'স্থগিত দ্বন্দ্ব' সংস্করণও নয়, এখানে মূল বিষয়টা হল একটা আদ্যোপান্ত, আপাদমস্তক আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা লজিক। ডায়ালেকটিক্স আর নয়, তার জায়গায় ওভারডিটারমিনেশন, অতিনির্ণয়। (রেউর মতে, হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্সের, দ্বন্দ্ব-লজিকের একটা ছোট্ট একচিলতে বাস্তুভিটেও রয়ে যায়, এর মধ্যেই, আহরাইজনপ্রসারী অতিনির্ণয়ের জোতজমির সাইড ঘেঁষে, সেটা এই অতিনির্ণয়ের সীমায়, সীমানা-এলাকায়, যেখানটায়, যার পরে অতিনির্ণয় আর কাজ করতে পারেনা, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্য আলোচনা।)

পরোক্ষ বিপ্লব নিয়ে গ্রামশির আলোচনা চিরাচরিত হেগেলীয় বর্গগুলোকে ব্যবহার করতে গিয়ে, অ্যাকচুয়ালি, তাদের গোষ্ঠীর পিণ্ডদান করে দেয়। ভুষ্টিনাশ করে ছাড়ে। হেগেলের প্রাচীন স্থির শান্ত এসেনশিয়ালিস্ট ভূমি আর নেই, এই অধুনালব্ধ এলোমেলো এবড়োখেবড়ো ছিন্নভিন্ন ভূমিতে কিছুতেই বেশ আরামে ঠ্যাং ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসতে পারেনা তারা। ফলতঃ ডাইরেক্টলি এসে পড়ে আর একটা নতুন কিসিমের আলোচনার এবং তত্ত্বের প্রশ্ন। যে বেশ কাবেল, যার এলেম আছে এই নতুন মালভূমির পাথরে পাথরেই পদ্মফুল ফুটিয়ে ছাড়ার। যে ইতোমধ্যেই গাঁটছড়া খুলে দিয়েছে গ্রামশি আর হেগেলের। অটোমেটিকালি, গ্রামশির পরোক্ষ বিপ্লবের তত্ত্ব এবার তার নয়া বোষ্টুমীর সঙ্গে রসকলি কাটতেই পারে — আলথুসেরের অতিনির্ণয়বাদী তত্ত্বকাঠামো তো মুখিয়েই আছে, দুচোখ ভরে দেখবে আর মুগ্ধ হবে, কণ্ঠী বদলাবে, তারপর, উঃ, সে কী উর্বরতার ধূম। নয়া নয়া তত্ত্বপ্রসূতি। ফলতঃ, এর ভিতর দিয়ে পরোক্ষ বিপ্লবের গ্রামশিয় তত্ত্ব নিজেও বদলে যাবে, অভিযোজন, মিউটেশন, এবার তাকে আমরা ডাকব 'প্যাসিভ রি-ইভ্যালুয়েশন' বলে।

৪।। উত্তরআধুনিক হেজেমনি

একদম বাস্তব, কংক্রিট একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনাটাকে লাগানো যাক। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার ভুবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : আধুনিকতাবাদ এবং ঐতিহ্য, মডার্নিজম এবং ট্রাডিশন — এই দুটোর ভিতর পারস্পরিকতা, একটা কথোপকথন। এখানে একটা নাটক আছে। পোস্টমডার্নিজমের উদ্ভব বলুন, বা, পুরো নবজাগরণ-আলোকপ্রাপ্তি-এনলাইটেনমেন্ট এই ব্যাপারটার প্রতি পোস্টমডার্নিজমের তীব্র বিদ্রূপ, শ্লেষ এবং চূড়ান্ত

বিরুদ্ধতার কথা বলুন, বা, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় অর্থাৎ যুক্তি বা রিজনের বিজ্ঞানের টেকনোলজির শাসনে আনার মডার্নিস্ট আধুনিকতাবাদী প্রোজেক্টের প্রতি পোস্টমডার্নিজমের বিরূপতার কথা বলুন — এই সবটা মিলে বেশ জবর একটা নাটক। যা ট্রাডিশন-কে ঐতিহ্যকে টেনে এনেছে নতুন আলোচনার রঙ্গমঞ্চে, কাঠগড়ায় খাড়া করে দিয়েছে তাকে, তার বাইনারি অপর আধুনিকতাবাদ বা মডার্নিজম-এর মুখোমুখি।

উত্তর-ঔপনিবেশিকতার, পোস্টকলোনিয়ালিটির আলোচনায়, আলোচকদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায় ট্রাডিশন আর মডার্নিজম-কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর। এবং এই তাত্ত্বিকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বারবার বলেন মডার্নিজম আর ট্রাডিশন এই দুইয়ের ভিতর সমানে-সমানে, মানে, ইয়ে, গনতান্ত্রিক, একটা ডায়ালগের প্রয়োজনীয়তার কথা। ডায়ালগ বলতে একটা প্রতিপ্রাপকতা, পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া। ওদিকে, নৈকষ্য-কুলীন নিষ্কলুষ পৈতেধারী মডার্নিস্টদের সংকল্প ট্রাডিশনকে নির্বংশ করে ছাড়ার, তারা তাদের আরব্ধ হিশেবে চিহ্নিত করেন ট্রাডিশনের এবং ট্রাডিশনাল সমাজের শর্তহীন অপনোদনকে। এই পুরোটাকেই আমাদের ভারি ছেলেমানুষি বলে বোধ হয়, বা, ছেলেমানুষি নয়, বলতে পারেন ক্যাবলামি — ট্রাডিশন আর মডার্নিজম এই দুটোকে এভাবে আলাদা করা, তাদের শত্রুতা চিহ্নিত করা বা তাদের একটা ডায়ালগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা। বলতে ইচ্ছে হয়, ওহে খোকনেরা, ট্রাডিশন আর মডার্নিজমের ডায়ালগ এমন একটা কিছু নয় যা তোদের বা আমাদের ইচ্ছে বা অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে, এমন কিছু নয় রে যাকে তোরা আবাহন বা বিসর্জন করবি। তোদের বা আমাদের বা আমাদের উভয়ের বাবাদের কোনো তোয়াক্কা না রেখে সেই ডায়ালগ ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, অলওয়েজ অলরেডি, চলছে চলবে। অ্যাকচুয়ালি এই ডায়ালগটাই হল আমাদের চারপাশ, যা, আমাদের বেঁধে পেটাচ্ছে। আমরা চাই বা না-চাই। ডায়ালগটা হয়ে চলেছে। কখনো বিরাট জোরে, চীৎকার করে, সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে, ই-নেটের ই-মোশনে, কখনো সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের ঝোপের আড়ালে, নিঃশব্দে, কুছ না কহো, কুছ ভি না কহো, সময় কা ইয়ে পল থামসা গয়া হ্যায়। নানা জায়গায়, নানা চেহারায়, নানা স্তরে, নানা মঞ্চে, পর্দায়, সাজঘরে।

শুধু একটা জিনিষই করতে পারি আমরা। খাপ পেতে অপেক্ষা করে থাকা, এই আবহমান ডায়ালগের কাঠামোটা একটু চিনে নেওয়া, তার ভিতর ঢুকে যাওয়া, এবং নিজেদের বাসনা মোতাবেক তাতে একটু একটু ভাইটাল মোচড়। প্রাচীন জীর্ন থিয়েটারের কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে বাসা বেধেছিল রাশি রাশি পায়রা, তারা তাদের প্রাকৃতিকতায় দর্শকদের বেহাল করে ছাড়ছিল। এদিকে জৈন মালিকের থিয়েটার, পায়রাবধ চলবেনা। শেষে লোক রাখা হল, তারা মাঝরাত্তিরে মই নিয়ে কুলুঙ্গি টু কুলুঙ্গি সার্চ করবে, এবং ওয়ান বাই ওয়ান যুবক যুবতী বুড়ো বাচ্চা নির্বিশেষে প্রতিটি নিদ্রাতুর পায়রাকে মৃদু রকমের, ঠিক প্রেমিক আঙুলে নয়, তার চেয়ে আর একটু বেশি রিরংসায়, পেট টিপে টিপে ছেড়ে দেবে। নো খুন নো ক্যাজুয়ালটি। এরকম কদিন চলার পরেই পায়রারা বুঝতে পারবে তাদের এতদিনকার আশ্রয়ের আরামটা যেন ক্রমে ঘোলাটে হয়ে আসছে। চলে যাবে তারা, ক্রমে, অন্য থিয়েটারে, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে। আমাদের পজিশনটা অনেকটা এইরকম। পায়রাশিকারের পাওয়ার আমাদের নেই। ম্যাক্সিমাম যা পারি আমরা তা হল ওই মই হাতে কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে ঘোরা, আর অসম্ভব দক্ষ সূক্ষ্ম সুচারু প্রকারে প্রায় উচ্চারহীন রকমে অপারেশন পায়রাপেট।

ডায়ালগ চলা বা না-চলাটা তাই আদৌ কোনো প্রশ্নই নয়, প্রশ্ন হল সেই ডায়ালগটাকে নিজেদের ইচ্ছানুসারে, অল্পস্বল্প বা অনেকটা, যখন যেরকম সিচুয়েশন, খাতবদল ঘটানো। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন পরস্পরকে অতিনির্ণয় করে মানেই তাদের মধ্যে রেগুলার দেখাসাক্ষাত হয়, একজন অন্যকে দেখিয়ে কমলসরোবর থেকে সদ্য স্নান সেরে তুলে আনা পদ্মফুলের বোঁটা দাঁতে কামড়ায়, কানে ঠেকায়, তারপর জলের ঢেউয়ের মত মাথার শরীরের উপর দিয়ে দুলিয়ে এনে সজোরে নিক্ষেপ করে ওই সরোবরেই, অর্থাৎ, পরস্পরকে সিগনাল করে, অধিকারী ব্যতিরেকে যা বুঝবে না কেউ, বুঝতে হলে ডেকে আনতে হবে মন্ত্রীপুত্রকে। পরস্পর পরস্পরকে সিগনাল করে এবং অন্যের সিগনাল গ্রহণ করে। এই সিগনাল প্রেরণের প্রকৌশলটা বোঝাই আমাদের কাজ — লুচি-মাংস হাঁকানোর শেষে ঘুমঢুলুঢুলু চোখে যেমন সব প্রস্তাব নিঃসরণ করা হয় কনফারেন্সে কনফারেন্সে — পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতে আমাদের আশু কর্মসূচী। পদ্ধতিটাকে বোঝা, এবং, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে সিগনালগুলোকে একটু একটু করে বদলে দেওয়া, তাদের সত্তাটাকেই বদলানো, রিডিফাইন করা। মডার্নিজম আর ট্রাডিশনের এই যুগলবন্দী বুঝবার জন্যে প্রথমে কান তৈয়ার করতে হবে, স্বর থেকে স্বর, মন্দ্রস্বর, শ্বাসাঘাত, অ্যাকসেন্টে কান অভ্যস্ত করতে হবে। তারপর আসে তাকে বদলানোর ব্যাঁকানোর মচকানোর গল্প। এই হিক্কা তুলতে থাকা সহস্রাব্দের মাথায় দাঁড়িয়ে মডার্নিজম কী আর কী-ই বা ট্রাডিশন সেটাই তো গুরু গুলিয়ে যাচ্ছে।

একটু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে সড়গড় করা যাক। ভারতের কালচারাল আর ইডিওলজিকালে, সাংস্কৃতিক আর মতাদর্শগত ভুবনে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এমনই একটা ডায়ালগ। 'মডার্ন' বলতে এখানে কিন্তু আমরা একটা টেকনিকাল শব্দকে ভাবছি, যার অর্থ জাস্ট 'আধুনিক' নয়, সমাজবাস্তবতার ঐতিহাসিক প্রকারভেদের একটা বিশিষ্ট প্রকার। ভারতের মোট রাজনৈতিক পদ্ধতিটাকে, বাস্তবতাটাকে আমরা বুঝি কিছু নির্দিষ্ট মডার্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিরিখে — বহুদলীয় গনতন্ত্র, জাত পাত লিঙ্গ ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের অধিকার, এবং, সর্বোপরি এমন একটা রাষ্ট্র যা দাঁড়িয়ে আছে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের উপর। ক্ষমতাসীন দলকে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তার শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করতে হয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এর পুরোটাই মডার্নিজম।

কিন্তু, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটা মজা দেখুন, মজা কি, রীতিমত হেঁয়ালিই বলা যায় — মডার্ন এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মডার্ন এই প্রক্রিয়ার ভিতর ট্রাডিশন কী সটান ঢুকে আসছে, কোনো হেলদোল ছাড়াই। নির্বাচন প্রক্রিয়া মানে সুধী সমাজ, সিভিল সোসাইটি, তার অন্তর্গত ব্যক্তি নাগরিকেরা, এবং সর্বোপরি, তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের রুচি ও মর্জি মাফিক ভোট দেওয়ার অধিকার। মডার্নিজম-এর উপাদানগুলোকে চিনুন : সুধী সমাজ, ব্যক্তি নাগরিক, রুচি ও মর্জি, অধিকার। মজাটা এই যে ভারতীয় রাজনীতির এই পুরো প্রক্রিয়াটা ভীষণ ভাবে নির্ভর করে সংস্কৃতি / মতাদর্শের জগতের উপর, যার শিকড় ছড়ানো রয়েছে ট্রাডিশন-এর গভীরে গভীরে। নির্বাচনী প্রচারে কী ভয়ানক মিশে যায় দেবদেবী সন্দর্শন। দেবোপমতা, দেবী-উপমতা। ইন্দিরার নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছিল চিকমাগালুরে, সে সংবাদ আমরা দেখেছিলাম কাগজে, নৈবেদ্যে উপচারে ইন্দিরা-পুজো দিয়ে। নির্বাচনী প্রচারে দেবদেবীর মূর্তি আর হিন্দু পুরাণ কাজে লাগানো হয় মুর্হুমুহু। প্রায়ই কোনো দেবদেবীর অবতার হিশেবে সেল করা হয় প্রার্থীদের — ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি ইয়ুগে ইয়ুগে। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী জাতপাত আর ধর্মের ভিত্তিতে নিজের নিজের সম্প্রদায় থেকে আসা ভোটারদের সমর্থন আদায়ের আশায় এসব করা হয় । সীতা চিকলিয়া আর রাম গ্রোভিলদের কথাই ধরুন। বা, অর্ধনারীশ্বর এনটিআর। সিনেমা টিভি সিরিয়াল মারফৎ আসা এই অবতারদের মধ্যে দিয়ে কাজ করে একটা প্রতিনিধিত্বের কৌশল, রিপ্রেজেন্টেশনাল স্ট্র্যাটেজি। এই ক্যামেরাবাহিত অবতারেরা আপামর জনমনে, অন্ততঃ প্রাকৃতদের ভিতর, প্রতিনিধিত্ব করেন ওই দেবতাজগতের মতাদর্শের — আরো গুছিয়ে বললে, ট্রাডিশনের। এই প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি নির্মাণ করে রোপন করে ছড়িয়ে দেয় নয়া নয়া অর্থ — জাতপাত কাস্ট ক্রিড আর নৃগোষ্ঠীর ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত সম্প্রদায়গুলোর সম্মিলিত মনোভূমিতে। তাদের ট্রাডিশনে। তাদের আবহমান বিশ্ববীক্ষার মডেলে, ওই মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে, গুঁজে দেয়, অমুককে ভোট দিন, তুসুককে জয়ী করুন। এবং প্রায়ই এর ভিতর একটা বাইনারি দ্বন্দ্বমাধুর্যও থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ট্রাডিশনময় অবতারদের স্থাপনা করা হয় সেই সব বিধর্মীদের বিপরীতে, যারা ভারতকে পশ্চিমের সঙ্গে (পড়ুন, ট্রাডিশনকে মডার্নের সঙ্গে) ঠেলাকে মারুতির সঙ্গে জোর করে শুইয়ে দিচ্ছে একই বিছানায়।

আসলে কিন্তু জোর করে শোয়াচ্ছে না। মডার্নিজম এবং ট্রাডিশন কিন্তু ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই হয়ে রয়েছে বহুদিনের, বলা যায় চিরকালের, অচ্ছেদ্য শয্যাসঙ্গী। ট্রাডিশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা প্রকার আছে পৃথিবীকে দেখার (স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাচীন সব তালপাতার পুঁথিতে যার নাম লেখা হত 'ওয়ার্ল্ড আউটলুক', এসব সেই সমস্ত যুগের কথা যখনো 'ওয়ার্ল্ড' বলে একটা সম্পূর্ণ এবং অটুট সমগ্র ছিল, যার ইনে এবং আউটে লুক করা যেত)। সেই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, নিজের ধর্মশাস্ত্র পুরানাদি লোকবিশ্বাস এইসব দিয়ে ট্রাডিশন পৃথিবীকে দেখে এবং ব্যাখ্যা করে, কিন্তু, সমাজবিজ্ঞানের চালু কাঠামোয়, তার কোনো অধিকার নেই মডার্ন-এর দৃষ্টি বা ব্যাখ্যাকে কোনো চ্যালেঞ্জ

জানানোর। মডার্ন ইতিমধ্যেই হয়ে রয়েছে, ঘোষিত ভাবে, শক্তিমানতর উৎকৃষ্টতর। নিজেকে শূন্য করে দিয়ে যার শরীরে মিশে যাওয়াই ট্রাডিশনের স্বীকৃত প্রচারিত লেজিটিমেট ভবিতব্য। ট্রাডিশন-কে এইভাবে দেখা এবং মডার্ন প্রক্রিয়াগুলোর স্বার্থে ট্রাডিশন-এর এই পুর্নরোপন, ডিসেমিনেশন — এই দুটোই চলছে কিন্তু একটা মডার্ন পদ্ধতিতে, মডার্ন মেশিনে, ইলেকট্রনিক্সে, মিডিয়ায়। রাষ্ট্রশক্তি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরির উদ্দেশ্যে। পুরানের দেবদেবীরা তো কেবল তখনই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ধর্ম সংস্থাপন ইত্যাদি করতে পারবে যদি তারা ইলেকশনে জেতে। জিতে ওই মডার্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের মডার্ন কলাকৌশলের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। অন্যদিকে, জেতা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রযন্ত্ররথ চালিয়ে চলার মডার্ন কৃৎকৌশলের প্রতিটি স্টেপেই দরকার পড়বে পুর্নরোপিত পুর্ননির্মিত ওই ট্রাডিশনকে — লোকের কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করতে গিয়ে, জনমত পাকিয়ে তুলতে গিয়ে, গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত লোককে গেলাতে গিয়ে, আপামর প্রাকৃত সমুদ্রের ঢেউ ঠেলে ঠেলে নির্বাচিত সরকারের তরণী পাঁচ পাঁচটা বছর ভাসিয়ে রাখতে গিয়ে। কারণ, এই ট্রাডিশনই তো সেই একমেবাদ্বিতীয়ম মাধ্যম — জনসমুদ্রের প্রাকৃত সম্প্রদায়সকল আর সরকার নামক প্রতিষ্ঠানের ভিতর একমাত্র সেতু, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বওয়া বাগানের খাড়ির এপারে ওপারে লাবণ্যর মানসীর আর অমিতর দীপকের ভিতর জানলায় লাল আলো জ্বলা মিলনের রাতের একমাত্র সরু কাঠের সাঁকো (মাইরি, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, মিলনের রাত্তিরের সিগনাল হিশেবে অমিত লাবণ্যর বাড়িকে রেড লাইট এরিয়া করে দিতে বলেছিল)। এই সম্প্রদায়গুলো ভাবে, শ্বাস নেয়, স্বপ্ন দেখে ওই পুরান-ধর্ম-লোকবিশ্বাসের ট্রাডিশনের চিরাচরিত প্রাচীন চিহ্নগুলো দিয়ে, তাদের চিন্তার গাথা রচিত হয় ওই আবহমান দুখিনী বর্ণমালায়। ট্রাডিশনকে নিজের শূন্যস্থানে ফাটলে ফাটলে ভরে নিতে নিতে মডার্নিজম আসলে নিজেকে নির্ণীত, সরি, অতিনির্ণীত হয়ে যেতে দেয় ট্রাডিশনের দ্বারা। তার মানে কিন্তু তার উল্টোটাও, ট্রাডিশনও অতিনির্ণীত হয়ে পড়ে মডার্নিজমের দ্বারা, আগেই তো বলেছি, বারবার আর মনে করাচ্ছি না।

৫।। নতুন নতুন জাতের তত্ত্বগত ভূমি

তাই, এটাই হল ট্রাডিশন আর মডার্নিজমের অতিনির্ণয়, ওভারডিটারমিনেশন — এদের দুজনের মধ্যেকার ডায়ালগ। কেউই কাউকে আর জবাই খাললাস নাকচ নিগেট করতে পারেনা। দুজনেই বেঁচে থাকে নিজেকে এবং নিজের অপর-কে নিয়ে। এদের দুজনের ভিতর এবার চেগে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন একটা গতি — নেগোশিয়েশন, দর-কষাকষি — নেগেশন আর নয়। আম্মো ভালো তুম্মো ভালো। দরকষাকষি মানেই পারস্পরিক বোঝাবুঝি, অনুবাদ, দুজনেই দুজনের ভিতর ঢুকে আসা, স্থানান্তরন, মিউচুয়াল ট্রান্সলেশন। এবং নতুন নতুন সব অবস্থানের পুনর্নির্মাণ, রিলোকেশন। চালু উত্তরআধুনিকতাবাদী ইতিহাসপাঠ মডার্নিজম এবং ট্রাডিশনের নিগেশনহীন দরকষাকষির এই নতুন ধরনের ক্ষেত্রগুলোকে ডাকে সংকর ভূমি, হাইব্রিড স্পেস বলে।

কিন্তু আমরা এই তাত্ত্বিক সন্ধানটাকে আরো বাড়িয়ে তুলছি — আমাদের দাবি এই যে এই সংকর ভূমিও একবচন নয়, বহুবচন। সংকর ভূমির একটা প্রকার থেকে অন্য প্রকারের পার্থক্যগুলো বোঝা দরকার আমাদের। সংকর ভূমি বলতে এক কথায় বড্ড বেশি জিনিষকে বোঝায়, তাই আসলে স্পষ্ট করে কিছুই বোঝায় না। যেমন ধরুন, দুটো আলাদা আলাদা জীবনকে অস্তিত্বকে ভাবা যাক। যাদের একটার ক্ষেত্রে সামাজিক পাবলিক জীবনটা মডার্নিজম-এর নিয়ন্ত্রণে, আর ব্যক্তিগত প্রাইভেট জীবনটা ট্রাডিশন-এর। আর অন্যটির ক্ষেত্রে মডার্নিজমটা একদম গোড়া থেকেই ট্রাডিশনের উপস্থিতি দ্বারা আক্রান্ত, অতিনির্ণীত। এই দুটো সত্তার দুটোই তো এক কথায় সংকর ভূমি। তাহলে তাদের ফারাকটা আমরা চিহ্নিত করব কী করে? দ্বিতীয়টিতে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন মিলে মিশে আছে, মডার্নিজম-এর মধ্যেই ট্রাডিশন ওভারল্যাপ-এ খেলছে, খেলছে তার আলঙ্কারিক অতিরেকদের মেটাফরিক সারপ্লাসদের দিয়ে, যেমন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছি। এদের আলাদা আলাদা করে বোঝার জন্যে আমরা তিন ধরণের ভূমিকে চিহ্নিত করছি — সরল ভূমি, জটিল ভূমি এবং কৃত্রিম ভূমি। সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং সিন্থেটিক স্পেস। এদের দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরণের সংকর ভূমি বা হাইব্রিড স্পেসদের আভ্যন্তরীন পার্থক্যকে নির্দিষ্ট করতে পারব।

প্যাসিভ রেভলিউশন, পরোক্ষ বিপ্লবকে অতিনির্ণয়ের তত্ত্ব দিয়ে পাঠ করলে একটা নতুন ধরনের আলোচনাগত ভূমি, ডিসকার্সিভ স্পেস-এর হদিশ পাওয়া যায়, সেটাই কৃত্রিম ভূমি, সিন্থেটিক স্পেস। একটা ভূমি যা মডার্নিজম এবং ট্রাডিশনের দ্বারা অতিনির্ণীত, যেখানে তারা উভয়েই একগুচ্ছ ধারাবাহিক আলঙ্কারিক বদলের দ্বারা স্থানান্তরিত, ডিসপ্লেসড, পরিবর্তিত, নিজেদের পরিচিত অবয়ব থেকে, দুজনেই, সরে এসেছে অনেকখানি। এই আলঙ্কারিক বদল আবার দু রকমের, মেটাফোরিক এবং মেটোনিমিক। (মেটাফোর এবং মেটোনিম নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা একটু বাদেই আসছি।) আমরা আমাদের এই কৃত্রিম ভূমি বা সিন্থেটিক স্পেসকে খাড়া করছি জটিল ভূমি বা কমপ্লেক্স স্পেসের বিপরীতে।

কমপ্লেক্স স্পেস আর কিছুই না, চিরাচরিত হেগেলীয় ভূমিরই একটা পরিবর্তিত প্রকার, যেখানে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন নামে দুই বিশুদ্ধ বর্গ তাদের নিজেদেরকে প্রথমে হারিয়ে ফেলে, একটা সঠিক সঙ্গত সুঠাম ইউনিভার্সালের অভাবে, তার পর, একসময়, বোধহয় দু-একটা দাঁত পড়ার এবং কিছু চুল পাকার পর, আবার আবিষ্কার করে, আরে তাইতো কলিকাতা তো সেই কলিকাতাতেই আছে, সেই ট্রাডিশন তো সমানে চলিতেছে, শুধু আর অবিমিশ্র নেই, একটু বিমিশ্র হয়ে পড়েছে মডার্নিজমের সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে। অর্থাৎ? অর্থাৎ, তারা আবার নিজেদের খুঁজে পায়, ইউনিভার্সালেরই মুহূর্তের আকারে, হেগেলীয় পার্টিকুলারের আকারে। শুধু, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউনিভার্সালটাই আর প্রাথমিক অর্থে ইউনিভার্সাল নয়, এখন সেটা একটা ক্ষেত্রজ বা সারোগেট হেগেলীয় ইউনিভার্সাল। আদত ইউনিভার্সালের অনুপস্থিতিতে যাকে নির্মাণ করে তোলা হয়েছে। যেমন ধরুন, জাতি সত্তা হিশেবে রাষ্ট্র।

অন্যদিকে, সরল ভূমি বা সিম্পল স্পেস হল ওই হেগেলীয় ইউনিভার্সালই, কিন্তু আদত প্রাথমিকটাই। তার কোনো পুনর্নির্মিত সংস্করণ নয়। যা মডার্নিজমের বিভিন্ন মুহূর্তগুলোকে (স্টেট, সিভিল সোসাইটি) পরপর বিকশিত করে তোলে, আর একটু একটু করে অপনোদিত করে ট্রাডিশনকে। ট্রাডিশনকে মনে করে তলানী, রেসিডুয়াল — অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত। যাকে শুধু পরিত্যাগ করা যায় তাই নয়, পরিত্যাগ করা আশু প্রয়োজন, যুক্তি বা রিজনের পিছনে যা ফোঁড়ার মত ফলে থাকে, শান্ত হয়ে আরামে বসতে দেয়না কিছুতেই।

আমাদের কাজ এবার উত্তরআধুনিক, উত্তরঔপনিবেশিক, মার্ক্সবাদী এই রকম সব বিভিন্ন অবস্থান থেকে সিন্থেটিক স্পেস-কে তাত্ত্বিক ভাবে নির্ণয় করা। আমাদের সন্ধানের ভিতর প্রথমেই থাকবে উত্তরঔপনিবেশিক চিত্রনাট্য, তার ভিতর থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে আনা সিন্থেটিক স্পেসের বিভিন্ন মুহূর্ত। যদিও, খুব ভালোভাবেই এটা দেখানো যায়, এবং অন্যত্র আমরা দেখিয়েছিও, সিন্থেটিক স্পেস-এর ধারণাটাকে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ করা যায় এবং করতে হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তরঔপনিবেশিক-এর সম্পর্কটাকে ভালো করে বুঝতে চাইলে। তার আগে, সিম্পল এবং কমপ্লেক্স স্পেসের খুঁটিনাটি জটিলতাগুলোকে আর একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক, সিন্থেটিক স্পেস-এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের স্বার্থে।

প্রথমেই এটা খেয়াল করুন — সিম্পল এবং কমপ্লেক্স এই উভয় রকম ভূমির ক্ষেত্রেই এসেনশিয়ালিজম কিন্তু কাজ করে চলেছে। সিম্পল স্পেসের ক্ষেত্রে, আভ্যন্তরীন অনড় স্থিরতার এসেন্সটা কাজ করছে উন্মুক্ত ভাবে, সরাসরি — সমতা স্বাধীনতা দক্ষতা ইত্যাদি নীতিগুলোর ভিতর। কমপ্লেক্স স্পেসের উঠোনে এই এসেন্সেরও কিন্তু একটা পুনর্নির্মাণ ঘটে : একটা সারোগেট এসেন্স — সম্প্রদায়-চেতনার ট্রাডিশনাল অবস্থান এবং তার মডার্নিস্ট সংস্করণ, দুটোকে যেখানে ঘুঁটে দেওয়া হয়েছে, বরফ আর সিরাপ দুটো মিলিয়ে ধেনুর সরবত। তাই, কমপ্লেক্স স্পেসের গায়ে গজিয়ে ওঠে, গিজগিজ করে, বর্ণসংকর হাইব্রিড হওয়ার সব চিহ্ন, তার সারবস্তু এসেন্সটাই যে হাইব্রিড। এবং, সাংস্কৃতিক হাইব্রিডিটির বা মিশ্রণের যে ইতিহাস বহন করে কমপ্লেক্স স্পেস সেই ইতিহাসেও মিশ্রণটা কাজ করে এসেন্সের স্তরেই, আমাদের সম্মুখীন বাস্তবতার জগতে, ইমিডিয়েট রিয়ালিটিতে নয়। সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এই কমপ্লেক্স স্পেস অনুগামী ধারণাকে আমরা ডাকি কালচারাল ডাইভার্সিটি বা সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা বলে, এটা কিন্তু সঠিক অর্থে কোনো সাংস্কৃতিক হাইব্রিডিটি নয়। সেটা পেতে গেলে আমাদের যেতে হবে সিন্থেটিক স্পেসে — সেই প্রসঙ্গে আসছি আমরা।

সিন্থেটিক স্পেস কিন্তু বেজায় নির্মম। যাবতীয় জাত-অজাত-কুজাতের এসেন্সদেরই সে বিসর্জন দেয়, কল-কুঁদো-নল পুরো বন্দুকটাকেই। হাইব্রিড এসেন্স মারফৎ কোনো হাইব্রিড সাংস্কৃতিকতা এখানে চোরি চোরি চুপকে চুপকে ঢুকে আসে না। হাইব্রিড এসেন্স মানে, বরফ আর সিরাপ দুটোকে ঘুঁটে দেওয়া মানে, ধেনু তাদের ঘটিতে করে ঝাঁকানোর প্রাগ্‌মুহূর্ত পর্যন্ত বরফ আর সিরাপ দুটোই প্রাণপণে আলাদা ছিল, বরফ মানে বরফ মানে বরফ, শক্ত শক্ত, শাদা, ঠাণ্ডা, কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা, কিছুতেই সেটা সিরাপ না, সিরাপ তো বোতলে থাকে, তরল আর রঙিন। মেশানো মানেই আলাদা ছিল। ধেনু তো আর বরফে বরফ কিম্বা সিরাপে সিরাপ মেশাতে পারেনা, তাকে খেটে খেতে হয়, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ টাডিজ এর মত পাথর বসানো পাকা দোকান তো ছেড়েই দিন, হিন্দুস্কুলের সামনের ফুটপাতে সম্রাট অশোকের আমল থেকে সরবত বেচেও আজ পর্যন্ত সে কোনো পাকা দোকান করতে পারল না, চাকা লাগানো গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে রোজ দিবা দ্বিপ্রহরে। ধেনুরা বা সাবঅল্টার্নরা ওসব পারেনা, আমরা পারি, আমরা লিটল ম্যাগ করি, মানে, পাগল খ্যাপাই আর ছাগল চরাই। যাই হোক, কমপ্লেক্স স্পেসের হাইব্রিড এসেন্সকে হাইব্রিড করে তোলা গেল মানেই প্রাথমিক ভাবে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন এই দুটো পরস্পর স্বতন্ত্র দুই সত্তা।

আর সিন্থেটিক স্পেসে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন এই দুজনেই, ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, নিজেদের পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা, শুধু সুনীল দত্ত তার আলফা বিটা গামা এই তিন মাত্রার প্যাথোজ নিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন কেউই তাদের পুরনো স্বীকৃত সত্তায় আর নেই, হারিয়ে ফেলেছে তাদের চিরাচরিত অর্থ, তারা দুজনেই এখন শুধু পার্থক্য — ডিফারেন্স। সমাজ বাস্তবতার সাংস্কৃতিকের কালচারালের রকমফের প্রকারভেদ। দুটো ভিন্ন প্রকার। মডার্নিজম কী? না তাই যা ট্রাডিশন নয়, এবং ট্রাডিশন হল তাই যা মডার্নিজম নয়। সিন্থেটিক স্পেস হল এই দুইয়ের একটা অতিনির্ণীত সমগ্র — এইসব পার্থক্যের একটা ঐক্য।

আর এক ভাবে দেখলে, সিন্থেটিক স্পেসে, মডার্নিজম নিজের ভিতরেই বহন করে একটা উপচে যাওয়া ট্রাডিশনকে। আবার এর উল্টোটাও সত্যি। তারা দুজনেই এ অন্যের আলঙ্কারিক অতিরিক্ত, মেটাফোরিক সারপ্লাস-গুলোকে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ, তাদের একক পরিচিতিগুলো অসম্পূর্ণ এবং উন্মুক্ত, দরকষাকষির একটা জায়গা খোলা আছে সেখানে। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন দুটোই গেছে, এক অর্থে, হাইব্রিড হয়ে। এমনও বলা যায়, লাকাঁ যাকে অন্য আর একটা পরিপ্রেক্ষিতে সিম্বলিক স্পেস বলেছেন তারই আর এক নাম সিন্থেটিক স্পেস। উত্তরআধুনিক মহাবিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই কালচারাল হাইব্রিডিটিকে আমরা বুঝতে চাই এই সিন্থেটিক স্পেস বা সিম্বলিক স্পেস দিয়েই। একটু আগেই আমরা বলেছি, যেহেতু কমপ্লেক্স স্পেসে মিশ্রণটা এসেন্সের স্তরে, অ্যাপিয়ারেন্সে নয়, কমপ্লেক্স স্পেসের সাংস্কৃতিক মিশ্রণ কালচারাল হাইব্রিডিটি নয়, সেটা কালচারাল ডাইভার্সিটি।

এই বিষয়টা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যায় আমাদের — যে হাইব্রিড স্পেস দিয়ে আজ বুঝতে চাওয়া হচ্ছে উত্তরআধুনিকতার তত্ত্বীক্ষাকে সেটা আসলে লাকাঁর সিম্বলিক স্পেস। সমাজ বিজ্ঞানে প্রচুর প্রচুর কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে একে কাজে লাগিয়ে। লাকাঁর সিম্বলিক স্পেসের ধারণাকে কী ভাবে আমাদের সমাজ বাস্তবতাকে বোঝার কাজে সফল ভাবে লাগানো যায় এটা লামু দেখিয়েছেন তাদের তত্ত্বে। এবং এটা নিশ্চিত যে আজকের চালু উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক কাজগুলো আরো অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে লামুর এই পদ্ধতিকে নিজের আভ্যন্তরীন করে নিয়ে।

হাইব্রিড স্পেস (বা, হোমি ভাভার মতে থার্ড স্পেস, তৃতীয় ভূমি) বলতে যে তাত্ত্বিক ভূমিকে চিহ্নিত করা যায় তা কিন্তু প্রাথমিক ভাবে নতুন কথা কিছু বলেনা। বহুমুখী কার্যকারণ সম্পর্কে অতিনির্ণীত যে উত্তরআধুনিক ভুবনের কথা অন্য অনেকেই বলে গেছেন (যেমন লামু, যেমন রেউ), ভাভার হাইব্রিড স্পেস তারই আর একটা নতুন সংস্করণ। হাইব্রিড স্পেস-এ নতুন যেটুকু তা হল একটা উত্তরআধুনিক অতিনির্ণীত (বা, সিম্বলিক) তত্ত্বকাঠামোয় মডার্নিজম আর ট্রাডিশন এই দুটো মুহূর্তকে একত্রে একসূত্রে গেঁথে ফেলা । বাঘ এবং গরুকে নিয়ে একত্রে

কোকাকোলা খাওয়ার এই ক্যালিটা ভাভার, যেখানে রেউ এবং লামু টাইগার পার্কে গিয়ে শুধুই বাঘের রূপমাধুরী পান করছিলেন, গরুকে তারা টোটাল ভুলে মেরে দিয়েছিলেন, গরুকে, ট্রাডিশনকে, ট্রাডিশনাল সমাজ বাস্তবতাকে। তাই হাইব্রিড স্পেস এর তাত্ত্বিক ফলাফল এবং তাৎপর্য বিচার করাটা একটা জায়গায় খুব ইন্টারেস্টিং।

কিন্তু, আমাদের ধারণা, চালু উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যা, পোস্টকোলোনিয়াল কালচারাল স্টাডিজ এই জায়গাটায় উপর্যুপরি ধেড়িয়েছে। ওই শব্দ-ব্যবহারগুলো, যেমন, নিগেশন-এর জায়গায় নেগোশিয়েশন (নাকচের জায়গায় দরকষাকষি), বা, রিলোকেশন রিঅ্যালাইনমেন্ট ট্রান্সলেশন (পুনর্বাসন সজ্জাবদল স্থানান্তরণ) ইত্যাদি শব্দগুলো সংস্কৃতিবিদ্যার সাপেক্ষে একটা পর্বান্তরকে সূচিত করে, স্পষ্ট করে তোলে যে মোদ্দা ইশুটা এখানে অন্য কিছু নয়, একটা উত্তরআধুনিক অতিনির্ণীত সমগ্র, পোস্টমডার্ন ওভারডিটারমিন্ড টোটালিটি। যে ভুবন প্রথম থেকেই কাকতালীয় এবং অনিশ্চিত, কোনো রকম অনড় স্থিরতাই যেখানে নেই, যে দেশে প্রতিটি অর্থই বহুবচন এবং ঘাপলাপ্রবণ, প্লুরাল অ্যান্ড কনফ্লিকচুয়াল, এককথায়, খুব ডেফিনিট কোনো মামাপিশে নেই বেচারাদের, হরদম সেগুলোকে নিয়ে দরকষাকষি করা যায়, বেঁকানো যায়, ভাঙচুর করা যায়, সরকারি সম্পত্তির মত। দাঁড়াও পথিকবর, এবার থামো একটু, নিজেকে একটু প্রশ্ন করো, যে প্রশ্নটা ওই কালচারাল স্টাডিজওয়ালারা করেনি। এই অনন্ত রকমের উন্মুক্ত অর্থেরা তো ইতস্তত উড়ে ঘুরে এবং দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এবার, প্রয়োজন মোতাবেক, আপাতগ্রাহ্য রকমে, প্রভিশনালি, তাদের অবরুদ্ধ করব আমরা কী প্রকারে? কোন যাদুবলে? কারণ, কোথাও না কোথাও একটা, আপাতত এবং অস্থায়ী রকমে, অবরুদ্ধ তো তাদের করতে হয়ই। কার্য, অ্যাকশন মানেই একটা ফ্রিজশট, একটা জায়গায় আপনাকে থামিয়ে দিতে হয়েছে নিরন্তর প্রব্রজ্যার গতিটাকে, থামাতেই হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু একবার ধর্মতলা থেকে সিঁথিমোড়-বেকবাগান মিনিতে উঠবার পরপরই তাকে এক সহযাত্রী প্রশ্ন করে, "দাদা শ্যামবাজার পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?" রাত্রে কাঁটাবক্স হোস্টেলে ফিরে সেই বন্ধু আমাদের বলল, "কিছুতেই জানিস, বলতে পারলাম না"। আমরা বললাম, "কেন, বললি না কেন?" ও বলল, "আরে যতক্ষণে শালা হিশেব করছি, ধর, স্টেটসম্যান হাউজ থেকে কতক্ষণ লাগবে, হিশেবটা করতে করতে বাসটা চলে আসছে এয়ারলাইন্স। শেষে, 'ও একসময় ঠিক আপনি শ্যামবাজার পৌঁছে যাবেন', বলে, বাস থেকেই শালা নেমে পড়লাম।"

কিন্তু, এই রোখো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও, বলে সত্যিই তো এখান থেকে নেমে পড়া যায়না। আর, ইভেন যদি নেমে পড়েনও, এই নেমে পড়াটাও, এমনকী, একটা কার্য বা অ্যাকশন, যা করার আগে বুঝতে হবে, সত্যিই নেমে পড়াটা কতটা জরুরি। আর, খেয়াল করুন, 'বুঝতে' গেলেই অর্থেদের এই অবিরাম পদচালনাকে একটা জায়গায় থামাতে হবে আমাদের। নইলে বুঝতে বুঝতেও তো তারা বদলাতে থাকবে।

এবার, প্রশ্নটা হল, সেই বন্ধটা কোথায় এবং কী ভাবে করব? তার ফলাফল কী হবে? এই প্রশ্নটাই করে উঠতে পারেননি চালু সংস্কৃতিবিদ্যার ধুরন্ধরেরা — অতিনির্ণীত একটা কাঠামোয় ট্রাডিশন-কে ঢুকিয়ে এনে সংস্কৃতিবিদ্যা যদি এক স্টেপ এগিয়ে থাকে, দু স্টেপ তাহলে পিছিয়ে গেছে এই প্রশ্নটা করে উঠতে না-পেরে।

৬।। ক্লোজারের নানা কৌশল

রেউ আর লামু দুজনেরাই এই বন্ধ করার, ক্লোজারের প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন। রেজনিক-উল্ফ কোন পদ্ধতিতে তাদের উন্মুক্ত অতিনির্ণীত কাঠামোকে রুদ্ধ করেছেন, তাতে ক্লোজার এনেছেন সে আলোচনা অন্যত্র আমরা করেছি : এন্ট্রি-পয়েন্ট বা প্রবেশ-পথের ধারণাই তাদের অস্ত্র। অন্যত্র সে আলোচনা আমরা করেছি। তবু এখানে কুচো একটা ট্রিপ দিয়ে নেওয়া যাক। তারপর আবার আমরা ফেরত আসছি আমাদের আলোচনায়।

আমরা রেউর পদ্ধতিকে খুব ছোট করে এখানে বলে নিচ্ছি। রেউর কাঠামোর মূল তিনটি কী-কন্সেপ্ট বা কেন্দ্রীয় ধারণা হল : অতিনির্ণয়, দ্বন্দ্ব এবং প্রবেশ-পথ। ওভারডিটারমিনেশন, কন্ট্রাডিকশন এবং এন্ট্রি-পয়েন্ট।

এদের দিয়েই মার্ক্সীয় আলোচনার তত্ত্বকাঠামোয় অনুপ্রবেশ করছেন রেউ। মার্ক্স কোনোদিন অতিনির্ণয়ের ওভারডিটারমিনেশনের কথা বলেননি। ফ্রয়েড প্রথম ভেবেছিলেন, সেটা মনোজগতের বিভিন্ন ঘটমানতার ব্যাখ্যায়। মার্ক্সীয় তত্ত্বের জগতে একে আমদানি করেছিলেন আলথুসের। এবং নয়া-আলথুসারিয়ান রেউ একে উত্তরআধুনিক করেছেন।

অতিনির্ণয়ের মূল ধারণার সঙ্গে রেউ যোগ করেছেন অনেক উদ্বৃত্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং, এবং নিয়ে এসেছেন আরো নানা সম্পৃক্ত ধারণাকে, গ্রথিত করে তুলেছেন তাদের মোট কাঠামোটাকে। রেউ থেকেই কোট করা যাক।

> তত্ত্বকে সমাজেরই একটা অতিনির্ণীত পদ্ধতি বলা মানে এটা জানানো যে তত্ত্বের অস্তিত্ব তথা প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণ — এই পুরোটাই ওই সমাজের মধ্যে চলমান এবং সমাজের নির্ণায়ক প্রতিটি পদ্ধতির দ্বারা নির্ণীত। এই সমস্ত সামাজিক পদ্ধতিগুলোর সমগ্রের একটা জটিল মিলিত ফলশ্রুতি।

'অতিনির্ণয়' আমাদের ভাবায়, সচেতন করে তোলে ওই পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে। যারা এ অন্যকে বদলায় ভাঙে পুর্নর্নির্মাণ করে — প্রভাবিত করে। যাদের কেউই মৌলিক না, মূল না, আবার চূড়ান্তও না। কেউই উৎস নয়, সার নয়, শেষ কথা নয়। এসেন্স নয় তারা কেউই, তাই কেউই তাদের অ্যাপিয়ারেন্সও নয়। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই আজব রাজত্বে। এমনকী ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ায় তাদের কোনো ক্রমগুরুত্বও মানতে নারাজ রেউ, কারুর গুরুত্বই তাদের অন্য কারুর চেয়ে কম বা বেশি নয়। কন্ট্রাডিকশন বা দ্বন্দ্ব বলতে রেউ বোঝাচ্ছেন :

> ...ওই টানাপোড়েন এবং ধাক্কাধাক্কি — যা অতিনির্ণীত পদ্ধতির একটা বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, যে কোনো একটা পদ্ধতি মানেই সম্মিলিত ভাবে অন্য সমস্ত পদ্ধতির লীলাভূমি, ক্রীড়াক্ষেত্র।

এই ধাক্কাধাক্কি এবং গোলযোগের কারণ এই যে এখানে আর কোনো একনায়ক নেই, পুরোনো কাঠামোগুলোয় যা ছিল, সে হেগেলের এসেন্স-ই বলুন, আর মার্ক্স-এর অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার বলুন, যে তাদের শাসিত নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলিত রাখবে।

এখন ইনডিভিজুয়াল বা একক হল এমন একটা জমি যেখানে বহু খেলা করে বেড়ায়, বহুমুখী সব এলোমেলোপনা রাজত্ব করে চলে। ধরুন ইকনমিককে। (ভুল করবেন না, এখানে 'ইকনমিক' বা 'অর্থনৈতিক ' কিন্তু বিশেষণ নয়, বিশেষ্য।) ইকনমিক বা অর্থনৈতিক হিশেবে একজন ব্যক্তি হল শ্রমিক, যে কাজ করে তার ফ্যাক্টরিতে, অফিসে, মাঠে। আবার সে তো পলিটিকালও। রাজনৈতিক হিশেবে সে একজন ভোটার, মানে, সে ভোট সে শেষ অব্দি দিতে পারুক বা বুথে গিয়ে শুনুক যে তার ভোট দিয়ে গেছে অন্য কেউ, আসলে সে তো ভোটারই। আবার সেই লোকটাই তো একই সঙ্গে রিলিজিয়াস, ধার্মিক। প্রত্যেক কালীপুজোয় সে উপোস করে, বা, 'বাবা মার্ক্স-এর চরণে সেবা লাগে হে এঙ্গেলস' করে আসে প্রতি রবিবার বিকেলে, চোঁয়া ঢেকুর তুলতে তুলতে, রোববার দুপুরে মাংস খাওয়াটা তাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস। তাহলে শেষ অব্দি সে কী? একজন শ্রমিক? একজন ভোটার? একজন ধর্মভীরু? একজন স্বামী? একজন হিন্দু? সে কি তবে কেউ নয়? কী সে? কোনো একটা পজিশন সে কী করে নেবে? অনেকগুলো অবস্থানের একটা সম্মিলিত জট কাজ করে চলেছে তার আধারে।

রেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তাদের 'এন্ট্রি-পয়েন্ট' বা 'প্রবেশ-পথ'-এর ধারণা দিয়ে। ব্যাখ্যাকরণ বিশদীকরণের হারমেনিউটিক চক্রটা তো অবিরাম অবিরত ঘুরেই যেতে পারেনা, তাকে একটা জায়গায় ভাঙতেই হয়, থামাতেই হয়। ঠিক কোনখানটায় এটাকে থামাব এটা একজন থেকে আর একজনে বদলাতেই পারে। কারোর মনে হতে পারে, পাওয়ার বা ক্ষমতা-ই হল সঠিক জায়গা, বৃত্তটাকে ভাঙার। কারোর মনে হতে পারে, না না, ফার বেটার হয় যদি উপযোগিতা, ইউটিলিটি-তে থামাই। মার্ক্স এর দিকে একটা মাইল্ড অপাঙ্গদৃষ্টি হেনে, ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে, রেজনিক-উল্ফ তাদের পছন্দটা জানালেন : ক্লাস বা শ্রেনী : তাদের এন্ট্রি-পয়েন্ট বা প্রবেশ-পথ।

> 'ক্লাস' নামক এই অর্থনৈতিক ধারণাটি একটি এন্ট্রি পয়েন্ট। বা, বলা যায়, মার্ক্সীয় তত্ত্বের, বা এই তত্ত্ববীক্ষায় নির্মিত জ্ঞানের, একটা ফোকাস — মনোযোগের বিন্দু। কিন্তু, সার বা এসেন্স নয়।

আসলে, অন্যত্র আমরা এটা বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছি, রিচার্ড উল্ফ এসেন্স ব্যাপারটাকেই বদলে দিয়েছেন। এসেন্স ছিল অনড়, স্থির, আবশ্যিক। উল্ফ তাকে করে তুলেছেন শর্তসাপেক্ষ এবং আপতিক, প্রভিশনাল এবং কন্টিনজেন্ট। যাকগে ওসব কথা, মোদ্দা ব্যাপারটা হল এই যে একটা অনন্ত-উন্মুক্ত অতিনির্ণীত সমগ্রের শরীরে একটা সমাপ্তি আনলেন তারা। (সব খুলে ফেললে চলবে কী করে বাওয়া — সমাজ সংসার অ্যাকাডেমি ব্যবসা? দেখেননা না সেন্সরের লোকেরা স্কেল বসিয়ে মেপে নেয় — থ্রি ইঞ্চ ওভার জাইফয়েড।) এখানে শ্রেনী হল সমালোচনা-তাত্ত্বিকদের, ক্রিটিকাল থিয়োরিস্টদের একটা প্রকৌশল — উদ্বৃত্ত শ্রম সারপ্লাস লেবার-এর উৎপাদন, আত্তীকরণ এবং বন্টন, প্রোডাকশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনকে দেখার এবং ব্যাখ্যা করার।

লক্ষ্য করুন, আপনাদের অবশ্য বলে দিলেও যে করবেনই এর কোনো গ্যারান্টি নেই, শ্রেনী বা ক্লাস এখানে কোনো বিশেষ্য নয়, বিশেষণ। নাউন নয়, অ্যাডজেক্টিভ। এটা কোনো বিষয়ী-অবস্থান বা সাবজেক্ট-পজিশন নয়, বরং চিহ্নিত করে দেয় সমালোচনা তাত্ত্বিকদের একটা অবস্থানকে, 'শ্রেনী অবস্থান', যেখান থেকে সমস্ত পদ্ধতির মিলিত জটিলতার ভিতর থেকে একটাকে আলাদা করে আনা যায়, বোঝার সুবিধার জন্যে। এই অবস্থানটাই তাদের প্রবেশ-পথ, এন্ট্রি-পয়েন্ট।

এটা খুবই স্পষ্ট যে 'এন্ট্রি-পয়েন্ট' একটা সারবাদী বা এসেনশিয়ালিস্ট ধারণা। বা, বলা ভালো, একধরণের নিয়ন্ত্রিত বা কৌশলগত সারবাদ, কন্ট্রোল্ড বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম। তাঁর ১৯৯৬-এর লেখায় রিচার্ড উল্ফ খোলাখুলিই স্বীকার করে নিয়েছেন অতিনির্ণয় নামক আদ্যোপান্ত অ্যান্টি-এসেনশিয়ালিস্ট সারবাদ-বিরোধী কাঠামোর 'এন্ট্রি-পয়েন্ট' নামক এসেনশিয়ালিস্ট একটা উপাদানের কথা। যে কোনো একটা আলোচনার কাঠামোয় আলোচনার মাধ্যমে আমরা কী পেতে চাইছি সেটাকে নির্দিষ্ট করে দেয় এই এন্ট্রি-পয়েন্ট।

কিন্তু, মনে রাখবেন, এন্ট্রি-পয়েন্টটা ঠিক কী হবে তা কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে, আলোচনার চৌহদ্দির ভিতর ঠিক হচ্ছে না, হয়ে আসছে বাইরে থেকে, তাই এটা আভ্যন্তরীন নয়, বহিরাগত। এন্ডোজেনাস নয়, এক্সোজেনাস। অর্থাৎ, ওই আলোচনার সাপেক্ষে এন্ট্রি-পয়েন্টটা কিন্তু প্রদত্ত অনড়। অঙ্কে আমরা যাকে বলি প্যারামেট্রিক কন্সট্যান্ট। অর্থাৎ, ওই আলোচনার কাছে এটা একটা অপ্রশ্নেয় অনড়তা, এসেনশিয়ালিজম। অনেক আলোচনা মিলিয়ে, আলোচনা এবং বাস্তবতার পরিবর্তনের ভিত্তিতে ওই এন্ট্রি-পয়েন্টটা বদলাতেই পারে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আলোচনার কাছে তা সবসময়ই একটা প্রদত্ত অনড়তা। একটা আলোচনায় প্রবেশের যে প্রাথমিক মুহূর্ত, ব্যাখ্যার যে প্রাথমিক মুহূর্ত সেটাই আলোচনার সঙ্গে চতুর্পার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আলোচ্য বস্তুর সম্পর্কটাকে নির্দ্ধারণ করে দেয়।

ধরুন ক্লাস — শ্রেনী। যেই ক্লাসকে আপনি পছন্দ করলেন আপনার আলোচনার প্রবেশ-পথ হিশেবে, সেই মুহূর্তেই আপনার আলোচনার উদ্দীষ্ট নির্দ্ধারিত হয়ে গেল — আপনার চারপাশের বাস্তবতাকে আপনি বিচার করবেন সেই শ্রেনী নামক বর্গটির সংজ্ঞাটির নিরিখে। তখন আপনার সংগ্রামের ধারণাটাও হয়ে দাঁড়াবে শ্রেনী-সংগ্রাম। আপনার চারপাশের বাস্তবতাকে আপনি চক্রিত হতে দেখবেন শ্রেনী নামক ওই বর্গটির নিরিখে। আলোচনাটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেনীচেতনা ক্লাস-কনশাসনেসের আলোচনা।

তখন আপনি লিঙ্গ জাতপাত যৌনতার বর্গগুলোকে আপাতত আপনার আলোচনার ফোকাসে আসতে দিচ্ছেন না। নারীবাদের আন্দোলনকেও বুঝতে চাইছেন শ্রেনী দিয়ে, সমকামীদের সমস্যাকেও বুঝছেন শ্রেনী দিয়ে। ধরে নিচ্ছেন শ্রেনী সংগ্রাম চলতে থাকলেই জাতপাতের সব সমস্যা আপনা থেকেই মিটে যাবে, অন্তত মিটে যাবে কি যাবে না তা নিয়ে আপনার কোনো উৎপাটনই ঘটছে না। আপনি আপনার 'শ্রেনী' নামক বর্গটাকে ছেড়ে দিয়ে আর সব বর্গকে আপনার আলোচনাহলের টিকিটই দেননি। সবকিছুই ব্যাখ্যা করছেন শ্রেনী দিয়ে — এমনকি শ্রোণিভারাদলসগমনাদেরও।

নয়া-আলথুসারীয় সমস্ত তত্ত্ববীক্ষাকেই আপনি এই জায়গাটায় পার্টিজান মানে একপেশে বলতে পারেন। নিও-আলথুসারিয়ানদের কাছে তত্ত্ব মানেই তার একটা এন্ট্রি-পয়েন্ট আছে, এবং এন্ট্রি-পয়েন্টের সংজ্ঞাটাই হল এই যে তা ওই তাত্ত্বিকের দিক থেকে, তার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বাস্তবতাটাকে ব্যাখ্যা করে। ভালো করে লক্ষ্য করুন, এটা কিন্তু একটা অ্যান্টি-এসেনশিয়ালিস্ট সারবাদ-বিরোধী জায়গা। সারবাদ তখনই সারবাদ হয়ে ওঠে যখন আপনি আপনার অনড়তাটাকে চিনতেই পারেন না, স্বীকার করেন না, যেমন, শোনা যায়, কোনো পাগলই তার পাগলামি বুঝতে পারেনা। (কই, সত্যি নাকি, আমরা তো বেশ পারি।) ওই এসেন্সটাকে অনড়তাটাকেই যখন আপনি একমাত্র সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ বলে মনে করেন তখনই আপনি এসেনশিয়ালিস্ট। আপনারটাই একমাত্র প্রাকৃতিক ভাবে সত্য আর সকলই মিথ্যা।

তাদের উন্মুক্ত অতিনির্ণীত কাঠামোকে এন্ট্রি-পয়েন্ট নামক ধারণা দিয়ে রেউ কী ভাবে রুদ্ধ করছেন সেটা আমরা দেখলাম। এবার দেখা যাক এই সমস্যাটাকে লামু কী ভাবে হ্যান্ডল করেছেন। কারণ, সঠিক অর্থে, আমাদের কাজ জাস্ট সেইখান থেকেই শুরু লামুর-টা যেখানে শেষ। একটা অনন্ত-উন্মুক্ত অতিনির্ণীত উত্তরআধুনিক সমগ্রকে রুদ্ধ করার, ক্লোজার নিয়ে আসার লামু এবং রেউ পন্থার সুদূরপ্রসারী ফলাফল গুলো কী কী সেটাই আবিষ্কার করতে চাই আমরা।

লামুর আগাগোড়া কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাথমিক প্রকল্পের উপর যে সমাজ-বাস্তবতাকে একটা যৌক্তিকভাবে অটুট সমগ্র, র‍্যাশনালি ইউনিফায়েড টোটালিটি, হিশেবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটাই একটা অসম্ভাব্যতা। ওরকম কিছু আদৌ হয়ই না। যেসব বর্গ বা সংজ্ঞা বা আইডেন্টিটি এখানে কাজ করে সেগুলো নিজেরাই অসম্পূর্ণ এবং উন্মুক্ত, নিয়তই বদলাচ্ছে : অর্থাৎ, তাদের নিয়ে নানা রাজনৈতিক রাজপুত্রনৈতিক কোটালনৈতিক মায় বয়স্যনৈতিক দরকষাকষি সবসময়ই চলছে — এটা তাদের অস্তিত্বেরই একটা বৈশিষ্ট্য। এবং, অবভিয়াসলি, তাদের মধ্যে আছে পারস্পরিক অতিনির্ণয়। লামু খুব খুটিয়ে খুটিয়ে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অতিনির্ণীত সমগ্র বলতে তারা ঠিক কী বোঝাচ্ছেন। লাকাঁর পরিভাষায় যাকে সিম্বলিক বা প্রতীকী বলা হয় সেরকম

একটা সমগ্রকেই বোঝাতে চাইছেন লামু। তাই তাদের এই কাঠামোতে, স্বভাবতঃই, মেটাফোরিক ছেদ (মেটাফোরিক কাট) এবং মেটোনিমিক চ্যুতি (মেটোনিমিক স্লাইডিং) এই দুটি ধারণা তাদের কাঠামোকে বোঝার জন্যে ভীষণ বেশি ভাবে কাজে আসে। মানে, তারা যে কাঠামোটাকে নিয়ে রগড়াচ্ছেন, তাদের তত্ত্বের জগতে উপস্থাপনা করতে চাইছেন, সেটা যে উত্তরআধুনিক এ বিষয়ে বেজায় সচেতন লামু। এবং, সেটা জাস্ট যে কোনো একটা উত্তরআধুনিক সমগ্র নয়, এমন একটা সমগ্র যা এক চাদর ময়লিসি টুটিসি, ফাটা ভাঙাচোরা সেলাইকরা, উত্তরঔপনিবেশিক আলোচনা যেমন ধাঁচের সমগ্রকে নিয়ে বিচার করে, যেখানে কোনো পরিচিতি কোনো সংজ্ঞা কোনো আইডেন্টিটিই একক সুনির্দিষ্ট অনড় নয় আর, তাদের নিয়ে তাদের চারপাশে নিরন্তরই একটা দরকষাকষি চলছে।

এই দরকষাকষির পদ্ধতিগুলোর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন লামু। আমরা এখুনি দেখতে পাব সেগুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে মেটাফোর এবং মেটোনিমি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাই এই ক্ষেত্রে মেটাফোর তথা মেটাফোরিক ছেদ (কাট) বলতে কী বোঝাচ্ছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। বা, মেটোনিমি এবং মেটোনিমিক চ্যুতি (স্লাইডিং)।

৭।। মেটাফোর মেটোনিমি

মেটাফোর বা মেটোনিমি হল সেই দুই লাকাঁকথিত বর্গ যাদের উপর নির্ভর করে লামু তাদের অ্যান্টাগনিজম এবং হেজেমনি, বিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, এই ধারণাগুলোকে গড়ে তুলেছেন। নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি বিষয়ক লামুর আলোচনার সমালোচনা এবং সংযোজন করতে গিয়ে লাকাঁর আরো দুটো বর্গকে আমরা কাজে লাগাব — সিম্পটম (রোগলক্ষণ) এবং মিমিক্রি (নকল)।

এটা অনস্বীকার্য যে, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লামু যাসব বলেছেন তার মধ্যে নতুন ভাবে ভাবতে পারার, ভাবনার পুরনো মডেলগুলোকে ভাঙচুর করতে পারার ক্ষমতা যথেষ্ট রকমেই রয়েছে। কিন্তু, তাদের আলোচনার একটা বেমক্কা খামতি এইখানটায় যে প্রতিনিয়ন্ত্রণের, কাউন্টার হেজেমনির তত্ত্ব নিয়ে, প্রতিনিয়ন্ত্রণের কৌশল বা স্ট্র্যাটেজির থেকে আলাদা করে, তাদের কিছু বলার নেই। তাদের কাছে প্রতিনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব মানেই তার কৌশল — ধরুন, র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাসি। এই খামতিটা মেটানো যায় রোগলক্ষণ (সিম্পটম) নামে লাঁকার তাত্ত্বিক বর্গকে দিয়ে, এটা আমরা দেখাতে চাই। লাঁকারই অন্য আর একটা ধারণা — নকল (মিমিক্রি) — কাজে লাগে অন্য আর একরকমের নিয়ন্ত্রণ: পোস্টকোলোনিয়াল, উত্তরঔপনিবেশিক হেজেমনি-কে বুঝতে, চিহ্নিত করতে, স্পষ্ট করে তুলতে। যা করতে গিয়ে আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে লামুকে, শুধু লামু কেন, পেরিয়ে যেতে হবে আদ্যন্ত উত্তরআধুনিক আলোচনার অধিত্যকাটাকেই। কিন্তু, সেটা অন্যত্র। এইখানে, এই প্রবন্ধে আমাদের মনোযোগের ফোকাস এখন মেটাফোর এবং মেটোনিমির ফলাফলের উপর। আর, স্লাইট একটুখানি সিম্পটম এবং মিমিক্রি, লামুর সীমাটা (বা সীমাবদ্ধতাটা) বোঝাতে।

লাকাঁর মেটাফোর এবং মেটোনিমি আসলে আরো ধার পেয়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠা ফ্রয়েডের ডিসপ্লেসমেন্ট এবং কনডেনসেশন, স্থানান্তরণ এবং ঘনীভবন। ফ্রয়েড তার স্বপ্নপুরান লিখতে গিয়ে এই বর্গগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বপ্নের মেকানিজম বুঝতে গিয়ে। একটা স্বপ্নের গঠনে, (শুধু স্বপ্নের কেন, যে কোনো ভাষার গঠনকেও ভাবুন) দুটো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল প্রতিস্থাপন এবং সমন্বয়, সাবস্টিটিউশন এবং কমবিনেশন। স্বপ্নে সেই মুখ দেখেছিল রাজপুত্র, কমলসরোবরের জল নিয়ে সে খেলছিল, কালি নাগিন য্যায়সি তার কালি কালি জুলফ বেয়ে জলের ফোঁটা ঝরছিল, আরো কত মুখ দেখল, সারা রাত জুড়ে তার সুখস্বপ্নে, খুশবু লিয়ে য্যায়সে ঠান্ডি হাওয়া। তারপর তার দিন যায় রাত যায় মাস যায় রাজপুত্র বসে থাকে বিষণ্ণ গম্ভীর। কার, কার সে মুখ, কার? প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার। অথচ যন্ত্রণার মুখ তো সে দেখেনি, যন্ত্রণার তো আসলে কোনো থোবড়াই নেই, দেখেছিল অন্য মুখেদের, উজলে কিরণ বনমে হিরন-দের, তারা তো আসলে নিজেদের না, প্রকাশ করছিল প্রতিস্থাপিত পরমা যন্ত্রণাকে। এবং তারা সব মিলে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল, তারার সূচে সেলাই করে রাত্রি জুড়ে টাঙানো ওই একটা

মুখে, পরমা যন্ত্রণার — একই সমণ্বয়ে। সমস্ত মুখ ঘনীভূত হয়ে সমণ্বয়িত হয়েছিল ওই এক মুখে, ওই এক মুখকে স্থানান্তরিত করেছিল বহুমুখী প্রতিস্থাপনে।

আর ভাষায়? একটা শব্দ/ ছবি/ ধারণা প্রতিস্থাপিত করে অন্য আর এক বা একাধিক শব্দ/ ছবি/ ধারণা-কে। কখনো আরো ভালো করে পৌঁছে দিতে গিয়ে, কখনো আরো ধারালো করে তুলতে গিয়ে, কখনো বা মূল অর্থটাকে আংশিক বা পুরোপুরি গোপন করতে গিয়ে। আবার, কখনো, শব্দ/ ছবি/ ধারণাগুলো একটার উপর আর একটা সমাপতিত হয়, বা, একাধিক শব্দ/ ছবি/ ধারণা মিলেমিশে যায়, তৈরি করে নতুন একটা সমাহার বা সমণ্বয়। ভাষার শব্দ/ ছবি/ ধারণাদের এই আলঙ্কারিক বিকারগুলো যখন স্বপ্নে ঘটে, ফ্রয়েড তাদের নাম দেন ডিসপ্লেসমেন্ট এবং কনডেনসেশন, স্থানান্তরণ এবং ঘনীভবন। ডিসপ্লেসমেন্ট মানে শব্দ/ ছবি/ ধারণা-দের জায়গায় নানা চিত্রকল্পের, ইমেজের প্রতিস্থাপন, এবং কনডেনসেশন মানে তাদের সমণ্বয়।

এই বর্গীকরণে এবং ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড খুশ ছিলেন, কিন্তু লাকাঁর খুব একটা হৃদয় জুড়োলো না। যেমন, কেন ভাই, সাবস্টিটিউশন নিজেই কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারেনা? হ্যাঁ, পারেই তো, ঠেকায় কে? আরো লাকাঁ যখন চাইছেন। আরো ঝকঝকে ব্যাখ্যার আশায় লাকাঁ শান দিতে থাকলেন পুরোনো ফ্রয়েডীয় বর্গগুলোকে। এবার এই ফ্রেশ তকতকে বর্গদুটির নাম দিলেন মেটাফোর এবং মেটোনিমি।

মেটোনিমি বলতে বোঝায়, ফার্স্ট, একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবি যখন অন্য আর একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবি-র প্রতিনিধিত্ব করছে, যে শব্দ অনুপস্থিত কিন্তু অনুপস্থিত সেই শব্দের ইঙ্গিতটা এই উপস্থিত শব্দের ভিতরেই রয়েছে। আর সেকেন্ড, এই উপস্থিত প্রতিনিধি হল তার মূলের, যার সে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই শব্দের (বা, ছবি/ ধারণা-র) , একটা অংশ, টুকরো, খণ্ড। খণ্ডটাই এখানে সমগ্রের প্রতিনিধি। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে : 'রাজদণ্ড' মানে এখানে 'রাজত্ব' — যে সমগ্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ রাজদণ্ডটুকু। বা ধরুন বললাম, চলো গুরু, একটু হেগেল পড়ি। এখানে হেগেল পড়া মানে হেগেলের লেখা, তাঁর তত্ত্ব, সেই সম্পর্কে লেখা — এই পুরোটারই চর্চা। মেটোনিম হল একটা বিশেষ শব্দ/ ধারণা/ ছবি যা অন্য আর একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবির প্রতিনিধিত্ব করছে যে নিজে অনুপস্থিত কিন্তু যার সঙ্গে এই মেটোনিমটি কোনো না কোনো রকমে সম্পর্কিত। দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত মেটোনিমটি বহন করছে অদৃশ্য ওই শব্দ/ ধারণা/ ছবিটির একটা অতিরিক্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং। (দেরিদা এই মেটোনিমিক অতিরিক্ত অর্থকেই 'ট্রেস' বলে ডেকেছেন ।) আর এক ভাবে বলা যায়, একটা বইয়ের একটা অংশ, একটা চ্যাপ্টার সমগ্র গোটা বইটাকেই মেটোনিমিকালি বহন করে।

অন্যদিকে, মেটাফোর মানে প্রতিস্থাপন। অচেনাকে চেনা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। বা, বলা যায়, চেনার চৌহদ্দির মধ্যে অচেনাকে জাগিয়ে তোলে, স্পষ্ট এবং প্রতিভাত করে তোলে। অচেনাকে অনুবাদ এবং স্থানান্তরিত করে চেনা ভাষার ভুবনে। ধরুন একটা ফিল্মে তখন আমরা মেটাফোর বলব যখন পরপর দুটো শটকে সাজানো হল, জাক্সটাপোজ করা হল এমন একটা রকমে যে দ্বিতীয় শটটা একটা বিশেষ অর্থ তৈরি করল প্রথম শটটার সঙ্গে মিলে, প্রথমটার সাপেক্ষে, প্রথমটার সঙ্গে প্রতিতুলনার ভিতর দিয়ে। দয়িত দয়িতা দুজনে দুজনের আলিঙ্গনে ঝাঁপ দিল, আর তার পরের শটেই, গভীর অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটছে মেলট্রেন। দ্বিতীয় শটটা পৌঁছে দিল ওই প্রেমীদ্বয়ের ওই মুহূর্তের ওই আলিঙ্গনের অর্থ। যা তার আগে অব্দি অজানা ছিল দর্শকের কাছে — তাদের হৃদয়ের, আবেগ জগতের আভ্যন্তরীন গতিবিজ্ঞান। আভ্যন্তরীন সেই বিষ্ফোরণকে ধাবমানতাকে অনুবাদ করে দেওয়া হল দর্শকের চেনা ছবিতে চেনা ধারণায় : সুড়ঙ্গ মেলট্রেন অন্ধকার গতি। অনুপ্রবেশের উত্তেজনা। ইত্যাদি।

অর্থাৎ, এক কথায়, মেটাফোররা একান্তই পরিদৃশ্যমান। ভারি স্পষ্ট এবং উচ্চারিত, চোখে না পড়ে উপায় কী। চেনা আর অচেনা, তাদের মধ্যে মুখচেনাচিনির অভাবের দূরত্বকে অতিক্রম করে মেটাফোর, সংজ্ঞাগত ভাবেই তাই স্পষ্ট হতে বাধ্য, চেনা আর অচেনার মধ্যে ফারাকটাই এখানে অলঙ্কারের নাটকীয়তাটাকে তৈরি করে। কিন্তু, মেটোনিমেরা তা নয়। এবং সেই জন্যেই মেটাফোর আর মেটোনিম এই দুটোকে একই মুদ্রার দুই পিঠ বলে ভাবা যেতে পারে। মেটাফোররা নিশির ডাকের মত বাইরের অচেনা অন্ধকার থেকে ডাক দেয়, অচেনা উপস্থিতিকে

উচ্চারিত করে, অজানা অচেনা অনুপস্থিতকে উপস্থিত করে তোলে। আর মেটোনিমরা প্রতিনিধিত্ব করে অনুপস্থিত-এর। সমগ্র কাহিনীর একটা খণ্ডাংশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সমগ্র যার তারা প্রতিনিধি। তাই মেটোনিমরা অদৃশ্য থাকে, নজরে পড়ে না। মাথায়ই আসেনা যে সে তারা জাস্ট ওই খণ্ডটুকুই নয়, প্রতিনিধির মধ্যে সমগ্র তার নিজের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে রেখেছে। আর ওই খণ্ডটা তো নিছকই খণ্ড, তাকে ভুলে থাকা যায় সহজেই।

একজন সমালোচনা-তাত্ত্বিক বা অবেক্ষক-কাম-চিন্তাবিদের, যার কাজ শুধু দেখে যাওয়া, আর দৃশ্য ঘটনাকে তার তত্ত্বের ক্যানভাসে এঁকে যাওয়া, দৃষ্টিকোণ থেকে মেটাফোর আর মেটোনিমকে আমরা বর্ণনা করলাম। এই তাত্ত্বিক কিন্তু সেই অর্থে বিষয়ী বা সাবজেক্ট নয়। বাস্তবতার শরীরে বাস্তব ক্রিয়ার রকমফেরে বাস্তবতাকে বদলানো তার কাজ নয়, তার কাজ শুধু এঁকে যাওয়া। লামুর ক্যালিটা এইখানে যে তারা বিষয়ী সংস্থানের সাপেক্ষে মেটাফোর আর মেটোনিমের পুরো গুরুত্বটাকে দেখিয়েছিলেন। একজন সাবজেক্টের কাছে এদের ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে।

একজন সমালোচনা তাত্ত্বিক অবজার্ভার-থিংকার-এর কাছে মেটাফোর শুধু প্রচ্ছন্ন অর্থকে প্রকট করে তোলার কাজই সমাধা করে। দূরবীনের মত, দূরের ইয়েদের কাছে নিয়ে আসে। বিষয়ী বা সাবজেক্টের কাছে কিন্তু তা নয়। সাবজেক্টের কাছে, সকর্মক কর্তার কাছে, মেটাফোররা নিয়ে আসে বহুমুখিতার বার্তা — বড্ড বেশি অনেক সংখ্যক অর্থকে একসঙ্গে জ্যান্ত করে তোলে। আর সেইখান থেকেই, লামু দেখিয়েছেন, একটা কোনো অর্থকে বেছে নিতে হয় তাদের, যা থেকে ঘটে বিরোধের বিসমিল্লাহ, অ্যান্টাগনিজমের জন্ম হয় এই অর্থ বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া থেকেই। ফ্যান্টাসি-র ক্ষেত্র থেকে ভেসে আসা একটা কর্তৃস্থানীয় কেন্দ্রীয় দ্যোতক-এর (মাস্টার সিগনিফায়ার) গুরুত্বের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত একগুচ্ছ সক্রিয় দ্যোতক-এর (কি সিগনিফায়ার) মেটোনিমিক উদ্বৃত্ত অর্থেরা তখন বিষয়ীকে স্থির এবং পোক্ত করে তোলে, সমগ্রটাকে একটা নিয়ন্ত্রক অর্থ (হেজেমনিক মিনিং) দেয়, একটা সমাপ্তির (ক্লোজার) মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটার আলোচনায় আমরা একটু বাদেই আসছি। এখানেই লামুর প্রস্থান, অতঃ মঞ্চে প্রবেশ করেন স্লাভোই জিজেক। তার রোগলক্ষণ বা সিম্পটম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক যন্ত্রপাতি বাগিয়ে। যা দিয়ে তিনি এই লামু-কথিত সমাপ্তির বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন। অন্ততঃ আমরা এই নিয়ন্ত্রণ-বিরোধ-রোগলক্ষণ হেজেমনি-অ্যান্টাগনিজম-সিম্পটম মেগাসিরিয়ালে লামু-জিজেক এপিসোডকে এই ভাবেই দেখছি।

৯।। সিম্পটম

এখানটায় একটু গেছোদাদা টেকনোলজি নেওয়া যাক, সিম্পটম কী এটা বোঝার জন্যে আমরা প্রথমে বুঝি আসুন, সিম্পটম কী নয়। যেমন, প্রথমেই ধরুন, যেভাবে ডাক্তারিশাস্ত্রে 'সিম্পটম' বা 'রোগলক্ষণ' এই শব্দটা ব্যবহার হয়ে থাকে — রোগীর শরীর এই এই রোগলক্ষণ দেখাচ্ছে — তার সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের এই ব্যবহারের সম্পর্ক ভয়ানকভাবে কম। তার চেয়েও বড় কথা আমরা এখানে 'সিম্পটম'-কে তার নয়া-ফ্রয়েডীয় জোববা থেকেও খসিয়ে আনছি। সেখানে 'সিম্পটম'-কে দেখা হয় একরকমের একটা 'মানিয়ে-নেওয়া' হিশেবে। ইম্পালস বা উচ্ছ্বাস-এর বিরুদ্ধে মনোজগতের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা — এই দুটোর ভিতরে একটা মধ্যস্থতা — যাতে উৎকণ্ঠা বা অ্যাংজাইটি-কে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

সিম্পটম সম্পর্কে ফ্রয়েডের ভাবনা দাঁড়িয়ে আছে সাইক বা মনোভূমি বিষয়ে ফ্রয়েডের নিজস্ব ধারণার উপর, যেখানে সাইক হল একগুচ্ছ যৌক্তিক রূপকথা-র (বা র‍্যাশনালমিথ-এর) একটা সমারোহ, যা দিয়ে সাইক বা মনোভূমি নির্মিত। গোড়াতেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে আনকনসাশ বা অচেতন ('অচেতন' এখানে বিশেষ্য) একটা জমি, যেখানে চাষবাস করে সমস্ত প্রবণতাগুলো, যৌন প্রবণতারা, (সেক্স)ড্রাইভস। আনন্দ পাওয়ার আমোদ পাওয়ার উপায় এই প্রবণতা গুলোই। আমোদ-নীতি (প্লেজার-প্রিন্সিপল) সঞ্জাত যাবতীয় (যৌন) প্রবণতাগুলো এবার কনসাশে, সচেতন মনে, পয়দা করে একটা অপরাধবোধ (গিল্ট)। সচেতন মন এবার প্রাণপণে লড়ে যায় এই অপরাধবোধকে গিল্টকে গোপন করার, অবরুদ্ধ করার, সাপ্রেস করার। কিন্তু, হায়, উপরোক্ত প্রবণতারা এমতই শক্তিমান যে তাদের প্রকোপ এড়িয়ে সচেতন মনের কোনো পালানোর জায়গা থাকেনা। বন্দীশিবির থেকে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে তারা অ্যায়সান বাণী ছড়ায়, ক্রান্তির দ্রোহকালের পরিপ্লবের, যে, ফাইনালি, সন্ধি একটা করতেই হয়, মধ্যস্থতায় আসতেই হয়। ফলতঃ, গজিয়ে ওঠে একটা আপোষ-অবস্থা — কমপ্রোমাইজ

ফর্মেশন। যে আপোষ-অবস্থা তখন আমোদ-নীতি আর বাস্তবতা-নীতি, প্লেজার প্রিন্সিপল আর রিয়ালিটি প্রিন্সিপল দুটোকে নিয়ে আসতে পারবে যতদূর সম্ভব একই জায়গায়, মুখোশ পরিয়ে দেবে প্রবণতাগুলোর মুখে, আপাতত তাদের আর খুঁজেই পাওয়া যাবেনা, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলে বোধ হবে।

তাই, ফ্রয়েডের জগতে, সিম্পটম মানে একটা কলকব্জা, আনকনশাসের বানানো, যা দিয়ে ওই গেঁয়ো জংলী কুদর্শন প্রবণতাগুলোকে তাদের নিজের নিজের রং-ঢং বদলে নিয়ে ব্যক্তি-ভদ্দরলোকের পাতে দেওয়া যায়, শাহরিক পার্টি-সামাজিকতায় পেশ করা যায়। প্রবণতার মালিক নিজে যেমন, তেমনি অন্যরাও যাতে তাকে বা তাদের দেখে আর আঁতকে না ওঠে। এর একটা টিপিকাল উদাহরণ ট্রাডিশনাল একজন হিন্দু বিধবার শুচিবাই, কাচাকাচির বাতিক। দুর্ভাগা ওই নারী তার আনকনশাসে অবরুদ্ধ যৌন প্রবণতাগুলোর জন্যে নিজেকেই দোষী মনে করে। আনকনশাস তখন পাকিয়ে তোলে 'কাচাকাচির বাতিক' নামে ওই কায়দা, যা দিয়ে নারীটি তার পাপবোধকে মোচন করে, প্রবণতাগুলোর আদত অর্থকে গোপন করে, বদলে দিয়ে।

লাকাঁ যখন সিম্পটম আর সাইকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আবার নতুন করে ভাবলেন, তাঁর মনে হল, সিম্পটমরা গোপন করেনা বরং প্রকাশিত করে তোলে। লাকাঁর কাছে, এরা হল সিগনাল — রিয়াল অর্ডার অফ বিয়িং-এর সিগনাল।

(এই রিয়াল অর্ডার অফ বিয়িং বাক্যাংশটার কোনো কাছাকাছি বাংলা দোসর দেওয়ার চেষ্টা করলাম না, সেক্ষেত্রে আলোচনাটা অসম্ভব বিস্তৃত হবে এবং বিশ্রী রকমের একটা কুপথে মানে ডাইগ্রেশনে চলে যাবে। লাকাঁর এই রিয়াল-ইমাজিনারি-সিম্বলিক নিয়ে ভালো আলোচনা, বাংলায় তো বটেই, ইংরিজিতেও খুবই কম চোখে পড়েছে। যদি কেউ জানেন তো প্লিজ জানাবেন। রাজনৈতিক অর্থনীতির মতাদর্শগত দুনিয়ায় এর তাৎপর্য নিয়ে কাজ করেছেন জিজেক, তার 'সাবলাইম অবজেক্ট অফ ইডিওলজি'-তে। এবং অন্য জায়গায়। জিজেকের 'ট্যারিং উইথ নিগেটিভ'-এ 'রিয়াল' এবং 'প্যারোল' নিয়ে কিছু কথা আছে। লাকানিয়ান ইংক নামে তারা একটা নেটজিন-ও বার করছেন, এছাড়া, ফ্রেডেরিক জেমসনের আলোচনা আছে, 'দি ইডিওলজিস অফ থিয়োরি ভলুম ওয়ান'-এ, যদিও সেটা সাতাত্তরের লেখা, বেশ সাতকেলে। লাকাঁর একটা ভালো ভাষ্য এলি রালাঁ-সুলিভান-এর, 'লাকাঁ অ্যান্ড দি ফিলোজফি অফ সাইকোঅ্যানালিসিস'। লাকাঁডটকম-এ কিছু সাহায্য পেতে পারেন। আর 'মার্জিন অফ মার্জিন' নামে একটা এমএসএন কমিউনিটি বানানো হয়েছে, সেখানে আলোচনা করা যেতে পারে, অনেকে মিলে। তার ইউআরএল :

http://content.communities.msn.com/marginofmargin/messageboard

বা অন্য কিছুর জন্যে যোগাযোগের ঠিকানা :

paagol@vsnl.com

বাংলায় যেহেতু সম্পৃক্ত বিষয়ের আলোচনা খুব কম হয়েছে, এটুকু অসুবিধে মানিয়ে নিতেই হবে। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে যদি কোনো বই বেরোয় চেষ্টা করা যাবে তাতে একটা বিস্তৃত পরিশিষ্ট দেওয়ার।)

এই রিয়াল অর্ডার অফ বিয়িং, বিয়িং বা অস্তি-র এই বাস্তব রাজত্ব, যা টিঁকে থাকে, বেঁচে থাকে, বেড়ে চলে, সময় সাপেক্ষে, ডায়াক্রনিকালি, বাস্তব সময় বরাবর, জ্যান্ত মানুষের মুখে বলা জ্যান্ত ভাষায়, প্যারোল-এ। এই বাস্তব-কেও পড়ুন (অ)বাস্তব হিশেবে। আমাদের মনোভূমিজাত যে অবাস্তব জগতের অস্তিত্বটা বাস্তব, সেটা সত্যিই আছে, আমাদের মাথার ভিতরে, শব্দের বাক্যের ভাষার পিছনকার দ্যোতনা হয়ে। একটা শব্দ শুনলাম, বা বললাম। যাকে শুনলাম বা যাকে বললাম, তারা তো আছে আসলে শ্রোতার বা বক্তার মাথার ভিতরে, মনোভূমিতে, যেখানে ভাষা বেঁচে থাকে।

তাই সিম্পটম-রা ইঙ্গিত করে অস্তি-র সময়সাপেক্ষ (অ)বাস্তব রাজত্বকে, যা বেঁচে থাকে জ্যান্ত মানুষের মুখে বলা জ্যান্ত ভাষায়, প্যারোল-এ, অ্যাংজাইটি বা উৎকণ্ঠা-র বিপরীতে। ফ্রয়েড যেখানে সিম্পটম-কে ভাবছেন এবং আলোচনা করছেন নিষেধ-কন্টকিত পৃথিবীর পথে আমোদ-ভারসাম্য পাওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হিশেবে, লাকাঁ এই প্রশ্ন করেই চলেছেন : তাহলে কেন, কেন স্নায়ুমণ্ডল তাদের প্রাপ্য প্রশস্ত শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারছেনা সিম্পটমকে বিকিরণ করার পরও? বারবার কেন ফেরত আসছে সিম্পটম, সিম্পটম-রা, ফেরত আসছে আর এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে ব্যক্তিসত্তা-কে, সেল্ফ-কে, অহং-কে, ইগো-কে? কেন এই পুনরাবৃত্ত

সিম্পটম-রা তার রিজন-কে, যুক্তি-কে, যুক্তিবোধ-কে জেরা করছে বারবার? লাকাঁর কাঠামোয় ব্যক্তিসত্তা বা ইগো দাঁড়িয়ে আছে একধরনের একটা নিশ্চয়তার ভূমিতে। আর সিম্পটমরা তাদের ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চয়তায়, আত্মসংশয়ে, তাদের আত্মনিশ্চয়তার অভ্যন্তরেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে।

সিম্পটম, তাহলে, লাকাঁ মোতাবেক, একটা অবরুদ্ধ রিপ্রেসড দ্যোতকের জায়গায় একটা বদলি দ্যোতক। এ সাবস্টিটিউট সিগনিফায়ার ফর এ রিপ্রেসড সিগনিফায়ার। আর, একটু টেকনিকালি বলতে গেলে, অব্যক্ত বা আনসেইড-এর রেশ (ট্রেস)। আনসেইড মানে, লাকাঁর সংজ্ঞায়, আদার অফ দি আদারস (প্রথম 'আদার'-এর 'ও' বড় হাতের) — অপর-দের অপর। এখানে, একটু, লাকাঁর তিনটে বর্গকে ঝালিয়ে নেওয়া যাক : ইমাজিনারি, সিম্বলিক, এবং রিয়াল ('রিয়াল'-এর 'আর' বড় হাতের)। ধরা যাক, কাল্পনিক, প্রতীকী, এবং (অ)বাস্তব। কাল্পনিক মানে পৃথিবীটা — কল্পনার হালখাতা, রেজিস্টার — যাতে লিপিবদ্ধ থাকছে ছবিরা, সচেতন এবং অচেতন ছবিরা, চোখে দেখা এবং কল্পিত উভয় রকমেরই। কাল্পনিক (ইমাজিনারি) মানে কিন্তু, খেয়াল করুন, (অ)বাস্তব (রিয়াল) এর বিপরীত নয়। কারণ, যে ছবিদের নিয়ে কাল্পনিক নির্মিত, তারা, নিশ্চিত ভাবেই, এসেছে বাস্তবতার ভুবন থেকে।

প্রতীকী তৈরি হয় প্রতীক-দের নিয়ে। কিন্তু যে প্রতীকদের কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা কিন্তু প্রতিমা বা আইকন নয়, ভাষাগত অলঙ্কার নয়, এখানে প্রতীক মানে দ্যোতক বা সিগনিফায়ার। ফার্দিনান্দ দ সাসুর তাদের যেভাবে আলোচনা করেছেন সেই সংজ্ঞাটাকেই একটু বড় করে, আর একটু সাধারন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতীক বলতে এখানে সেই খুচরো বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন উপাদানেরা যাদের নিজেদের অভ্যন্তরে নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। অর্থটা নিতান্তই গজিয়ে ওঠে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর, যখন তারা প্রত্যেকের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় একটা জোট সৃষ্টি করে, সেই জোট হল ভাষাবাহিত — এই জোটের মধ্যেই বেঁচে থাকে তাদের অর্থ — এর বাইরে এরা অর্থহীন। লাকাঁর কাছে লাখ প্রশ্নের এক প্রশ্ন হল এইটাই — এই জোটটা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ?

রিয়াল, (অ)বাস্তব-এর জগত তো তাই যা ব্যাখ্যামূলক অভিজ্ঞতার কাছে ব্যাখ্যাকরণের প্রক্রিয়ার কাছে আগে থাকতেই অবরুদ্ধ, অপ্রবেশনীয়। এর সামনে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক-ও ধেড়িয়ে যায়, তোতলাতে এবং লাট খেতে থাকে। এবং এইসব উপদ্রুত এলাকায় এসে প্রতীকী পুরো মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্যাখ্যাকরণের জগতের কাছে এই পুরোটাই অপ্রবেশ্য নিষিদ্ধ অঞ্চল। এই পুরোটাই হল প্রতিসারনিক, রিফ্র্যাক্টরি। ('প্রতিসারণিক' বলে কোনো শব্দ কিন্তু হয়না, হওয়া সম্ভবও না, বোধহয়, কিন্তু ঘাড় ধরে হওয়ালে কার কী লোকসান? প্রতিসরণজাত/ প্রতিসরণীয়/ প্রতিসরন-উপযোগী = প্রতিসারণিক।) প্রতিসারণিক মানে একে পাওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতরেই নিহিত আছে একটা বেঁকে যাওয়া, জলের ভিতর আর্ধেক ডোবানো লাঠি যেমন, বিকৃত হয়ে পড়া। (প্রতিটি দ্যোতক-বিনিময়ের মধ্যেই এই কেলেঙ্কারিটা রয়েছে। কমলসরোবরের কিনারে নাম-না-জানা কন্যা যে গীবা-ইত্যাদির ভঙ্গী করেছিল, রাজপুত্র দেখেছিল, আর তার যে বিবরণ রাজপুত্র দিয়েছিল মন্ত্রীপুত্রকে, তারা কি, কোনোদিন এক হতে পারে? হওয়া সম্ভব? কিন্তু, আমাদের মনোভূমির (অ)বাস্তবে তার পুনর্নির্মাণ কিন্তু হতেই পারে, দেখেননি কোনোদিন কোনো কন্যাকে কোনো ভঙ্গী করতে, কখনো? দেখেননি পর্দায়, উর্মিলাকে, টাবুকে, রবিনাকে?) এরা প্রতিসারণিক, ব্যাখ্যা-প্রতিরোধী এবং সম্পূর্ণতার যে কোনো সংজ্ঞার থেকে শত হস্ত দূরে। এই জন্যেই লাকাঁর সেই কুখ্যাত ফরমুলা : দি রিয়াল ইজ ইমপসিবল : (অ)বাস্তব হল অসম্ভব। (অ)বাস্তব, তাই, যে কোনো সম্পূর্ণতা-ধারণার বাইরে, যেকোনো সম্পূর্ণতা-ধারণার যা বাহির বা আউটসাইড। এমন এক আউটসাইড যাকে কোনোদিন মুছে ফেলা যাবেনা, বাহির থেকে অন্দরে নিয়ে আসা যাবেনা। আপনার প্রতিবিম্বের মত, চিরকাল পাশাপাশি বসবাস করে গেলেন, অথচ কোনোদিন ছুঁয়ে দেখতে পারেন নি। এমন এক বাহির যা সব অপরের অপর — দি আদার অফ আদারস। অব্যক্ত। দি আনসেইড।

আইয়ে জনাব, এবার লাকাঁয় সিম্পটম-কে একটু টেকনিকালি পড়া যাক। সিম্পটম হল একধরনের মেটাফোর যা দিয়ে রিয়ালের, (অ)বাস্তবের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, অনুভূত হয় — কাল্পনিক আর প্রতীকী-র দুনিয়ায় এঁকে দেওয়া (অ)বাস্তবের চিহ্ন। সিম্পটম মানে বেমানান। 'বেমানান' শব্দটাকে আমরা লিখেও কেটে দিলাম। কারণ, সে

তো বেমানান নয়ও, সে এমনই যা বহিষ্কার এবং অন্তর্ভুক্তি দুটোকেই প্রতিরোধ করে। যাকে ইনক্লুডও করা যায়না, এক্সক্লুডও করা যায়না। (উত্তর)আধুনিক মানুষের পিছনে ফোঁড়ার মত সে ফলে থাকে, আগেই বলেছি। উত্তরআধুনিকতার চালু এবং কেন্দ্রীয় আলোচনাগুলো এখনো সিম্পটম নিয়ে আলোচনা করার মত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, কারণ জ্ঞানতত্ত্ব মোতাবেক অনন্ত-উন্মুক্ত একটা সমগ্র ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে কথা বলার কায়দা এখনো রপ্ত হয়নি তার। এই সমগ্রের শরীরে কোনো ধরনের কোনো সমাপ্তি, এমনকী তা যদি কৌশলগত হয় তাও, ঘটা মাত্রই সে আড্ডা ছেড়ে উঠে পড়ে, মাইরি আমার দেরি হয়ে গেছে রে, এবার যেতে হবে।

সিম্পটম মানে একটা ইগোর, ব্যক্তিসত্তার, আত্মনিশ্চয়তার আক্রান্ত হয়ে পড়ার প্রমাণ। লাকাঁর কাছে ইগো একটা নার্সিসিস্টিক বা আত্মরতিপরায়ণ নিশ্চয়তাবোধ। ইগোর বিশ্বস্ততার এবং নির্ভরতার ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে আসে অচেতন বা আনকনশাস। আর, ছিটকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চীৎকার করে জানান দেয়। তার নিজেকে জানান দেওয়ার হাতিয়ার ওই সিম্পটমসঞ্জাত সচেতন জীবনের তালগোল পাকানো গোলকধাঁধা। সিম্পটমগুলো তাই, তাদের ফলাফলে, টেনে বার করে আনে একটা হিংস্রতাকে। কারণ, ইগোর নিশ্চয়তাবোধের বা আত্মরতির কোনো খামতি ঘটা মানেই ইগোর অন্তর্লীন ঐক্য এবার চ্যালেঞ্জের সামনে এসে পড়ে। যা থেকে আসে তার মুকুর-দশার (লা স্তাদ দ্যু মিরোয়ার, দি মিরর স্টেজ) অধুনা-বিস্মৃত ক্রোধ-কাম-হতাশার পুনরাগমন এবং পুনরভিনয় : অপরের দৃষ্টি ও মুগ্ধতার প্রতি তার নির্ভরতার ইতিহাস। সিম্পটমের প্রকোপেই বয়স্থ ব্যক্তিও তখন ফের তার প্রাথমিকতম শৈশবে। লাকাঁচিত্রিত শিশু তার চোখের সামনে রাখা আয়নার দিকে তাকাত এবং ভাবত যে সে নিজেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন, আদতে, তাকে তার মা পেছন থেকে ধরে রাখত। সিম্পটমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বয়স্থ শিশু এবার যে কোনো মূল্যে অস্বীকার করতে চায় তাকে তার পিছন থেকে ধরে রাখা কোনো ক্ষমতাশালীতর হাতের বৃত্তান্ত। অন্যত্র ('মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর'-এ) আমরা দেখিয়েছি ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতি। রাজনৈতিক অর্থনীতির শাসক এবং কেন্দ্রীয় ঘরানাগুলো জাস্ট কিছুতেই কান দেবেনা এমন কোনো আলোচনায় যা 'পণ্য' নামক ধারণাটিকে সমতা নামক নীতির উপর নির্ভরশীল একটি আত্মগত আত্মনির্ভর সেল্ফ-কন্টেইন্ড বর্গ হিসাবে দেখাকে একটা সিম্পটম হিশেবে ধার্য করে। এটা চালু এবং শাসক মার্ক্সচর্চার টোলগুলোর ইগোয় আঘাত করে — তাদের এতদিনকার চেনা খিড়কিপুকুরের রাস্তা : পণ্য থেকে শুরু করে পুঁজি, প্রায় হাতের তালোর মত করে চেনে তারা, সেই চিরাচরিত চেনা রাস্তাকে নাকচ করা, এবং বলা, যাও, পুঁজি থেকে পণ্যে পৌঁছও — এতবড় আস্পর্ধা।

আমরা নকল বা মিমিক্রি-কে একটা বর্মনির্মাণ বা ডিফেন্স মেকানিজম বলে ভাবছি। সিম্পটমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একটা উপায়। শুধু একটাই গুরুত্বপূর্ণ তফাত। বাস্তবতাকে নাকচ করার জায়গায় ইগো এখানে এমন একটা প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়, যাকে বলা যায়, মূল বাস্তব সমগ্রের একটা পুনরাবৃত্তি, কিন্তু পুরোপুরি নয়। প্রায়-পুনরাবৃত্তি বলতে পারেন। ফলতঃ যা দাঁড়ায় তা হল নিজেরই একটা নকল — প্রদত্ত সমগ্রের একটা মেটোনিমিক সংস্করণ, যা দিয়ে যাকে সামনে রেখে সে এবার নিজেকেই গোপন করে। মেটোনিমি নিয়ে আমাদের একটু আগের কথাগুলো মনে করুন। নিজের অসম্পূর্ণতার মুখোমুখি ফেস-টু-ফেস দাঁড়িয়ে, নিজের খামতিটা দেখে, সে এবার পাকিয়ে তোলে আর একটা ফাঁক, আর একটা খামতি, খামতি নাম্বার টু। যে খামতি নাম্বার ওয়ান কে গোপন করবে। ফাঁক-আবিষ্কারের ভয়ে ফাঁক-উদ্ভাবন, ফাঁক শো করে স্প্লিট ওয়াইড ওপেন করার করার সাহস তো আর সবার থাকেনা।

'গুংগা'-প্রত্যয়িত প্রতিভাধিকারী পিতৃব্যের প্রস্তুত প্রচণ্ড যন্ত্রটির কথা স্মরণ করুন — পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘন্টায় চলে — কারণ, গাধার সামনে মুলোর মত চোখের সুমুখে ঝুলছে জ্বলন্ত লালসা, উৎসাহেতে হুঁশ রবে না, চলবে কেবল ধেয়ে। এই খামতি বা ল্যাক সমন্বিত মূল (অ)বাস্তব এবং তাকে গোপন করতে আরো আরো ল্যাক নির্মাণ — এই দিয়ে ভীষণ ভালো করে বোঝানো যায় আমাদের উত্তরঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে। দু-এক কথায় বললে ব্যাপারটা এইরকম : ইংরেজরা ইংরেজদের দেশে এনেছিল পুঁজির সাম্য। সেই সাম্যও আসলে সাম্য না, কারণ, সাম্য বলে কিছু হয়না, নেই। পুঁজির পক্ষেও তাই সম্ভব না সাম্য সৃষ্টি করা। পণ্য-নির্মাণের বিমূর্ত শ্রমের

ভিত্তিতে পুঁজি সাম্য নির্মাণ করে। সবাই সমান কারণ সবাই তাদের শ্রম দিয়ে অর্থ উৎপাদন করে। কিন্তু অসাম্য রয়ে যায় তার ভিতরেই। ধরুন, কারখানাঘর। সেখানে, শ্রমিকের শ্রমশক্তির সঙ্গে তার দেহও শ্রমের খাঁচায় বন্দী। চিড়িয়াখানার জন্তুর মত। তাই এখানে চলছে আদিম শাসন। সাম্য নেই। আবার ধরুন, পুঁজির অধীন মজুরি শ্রমিক শ্রমিক হয়ে উঠছে তার বাল্যে তার মায়ের অভিভাবকের যত্নে, বা, সেই শ্রমিক রোজ তার শ্রম দিয়ে চলতে পারছে তার গৃহের গৃহস্থালী শ্রমের ভিত্তিতে। এ দুটোর কোনোটাই বিমূর্ত শ্রমের অর্থ উৎপাদক সাম্যের আভ্যন্তরীন নয়। তাহলে বিমূর্ত শ্রমের সাম্য কিন্তু, যথার্থ নয়, কারণ, সেই সাম্য নির্মিত হচ্ছে তার ভিতরে অসাম্যদের বহন করে। এবার, ইংল্যান্ডের ইংরেজরা অন্তত এই সাম্যটুকু পায়। সেটাকে সামনে ঝোঝুল্যমান দেখে ভারতীয় প্রজাকুল, মূলতঃ তাদের কুলীন অংশ (আম-প্রাকৃতের কিছুতেই কিছু এসে যায়না, জমিদাররা ঠাকুরই হোক, আর গডই হোক) ধেয়ে চলত জর্জ এবং জনদের, পঞ্চম জর্জ এবং বুল জনদের, জনগনমনঅধিনায়কদের, মানে ইংরাজদের, প্রদত্ত ঔপনিবেশিক সাম্যের দিকে। কী রেলা তাদের। ওরে তোদের শাসন করছে কে — ওই ফ্রান্স পর্টুগাল মোর্টুগাল কেউ হবে — আর আমাদের করছে ইংরেজ, রুল ব্রিটানিয়া, ব্রিটেন রুলস দি ওয়েভস। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত। ইংরাজাধীন ভারতীয় উপনিবেশিতরা যা পেত তা সেই পুঁজির সাম্যটুকুও নয়। তাদের সামনে থাকত ইংল্যান্ডের রিয়াল, (অ)বাস্তব, তাকে দেখে তৈরি হত আর একটা ল্যাক, ঔপনিবেশিক সাম্য। সরলপ্রাণ ঠাকুরেরা এবং অন্যান্য দেবতারাও, ইংরেজনিসৃত সাম্যে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস না করলে, বিশ্বাসভঙ্গের বেদনাটা আসেনা। ঠাকুরদের প্রত্যাখ্যান করতে হয়না 'স্যার' উপাধি। সাম্যে বিশ্বাস করে না নিলে তো প্রত্যাখ্যানটাই আসেনা। ইংরেজদের (অ)বাস্তব সাম্যের নকলে মিমিক্রিতে ভারতে ছিল ঔপনিবেশিক সাম্য। তারও একটা সীমা থাকে, যার বাইরে গেলেই বাস্তবতার শরীরে ফুটে ওঠে সিম্পটম, ওই জালিয়ানওয়ালাবাগ এমনই একটা সিম্পটম। যাকগে, সেসব অন্য আলোচনা, অন্যত্র করার। আমরা বরং ফেরত আসি আমাদের লামুতে।

১০।। বিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ

এবার দেখা যাক, লাকাঁর এই বর্গগুলো লামুর বিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ-এর, অ্যান্টাগনিজম এবং হেজেমনির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কী মাল ছড়ায়। উত্তরআধুনিক সমাজপদ্ধতির ব্যাখ্যায় লামুর বিশেষত্বটা এইখানে যে তাদের বিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ-এর ধারণাগুলোকে সরাসরি অণ্বিত করা যায় মেটাফোর এবং মেটোনিমি বিষয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা আমরা করলাম তার সঙ্গে। বিরোধ বা অ্যান্টাগনিজম সিগনাল করে :

> ... কোনো সুস্থিত এবং নিশ্চিত পার্থক্যের, ডিফারেন্সের — তথা, কোনো রকম কোনো বস্তুভিত্তির, বাস্তবিকতার, অবজেক্টিভিটির ... সেই চূড়ান্ত অসম্ভাব্যতা ...

সমস্ত রকম বস্তুভিত্তির সীমা-র এই অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা — এটাই নিজেকে স্পষ্ট উচ্চারিত করে তোলে আলোচনার জগতে — আর, সেটাই লামুর সংজ্ঞায় বিরোধ বা অ্যান্টাগনিজম। অন্য ভাবে বললে, লামু শুধুমাত্র ফাটল-ভাঙচুর-ঘা-এ-আক্রান্ত, সীমা-নির্দিষ্ট (অর্থাৎ, একটা শুরু বা শেষ আছে) একটা উত্তরআধুনিক বাস্তবতার কথাই বলেননি, তারা খুব ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছেন সীমা-টা ঠিক কোথায়। বিরোধ একটা তাত্ত্বিক ধারণা যা দিয়ে তারা এই সীমা-র ভবন বা বিকামিং-কে ধরেছেন।

> ... বিরোধ, একটা বস্তুভিত্তিক সম্পর্ক হওয়া তো দূরে থাকুক, নিজেই এমন একটা সম্পর্ক যার ভিতরে দেখানো থাকে প্রতিটি বস্তুভিত্তির বা অবজেকটিভিটির সীমা — সেই অর্থে যেভাবে উইটগেন্সটেইন বলতেন যে, যা বলা যায়না তা দেখানো যায় ... বিরোধেরা থাকে সমাজের অন্দর-এ নয়, বাহির-এ বরং তারা সমাজের সীমা-গুলোকে বানিয়ে তোলে, সমাজ-এর নিজেকে সম্পূর্ণ বানিয়ে তোলার সেই (অন্তর্লীন) অসম্ভাব্যতাকে।

লামুর এই গুরুত্বপূর্ণ বর্গটাকে খুব ভালো ভাবে বোঝা দরকার, যদি আমরা দ্বন্দ্ব আর বিরোধ-এর ভিতর, কন্ট্রাডিকশন আর অ্যান্টাগনিজম-এর ভিতর, কোনো ফারাক করতে চাই। দ্বন্দ্ব থাকা মানে আলোচনার ভূমিতে ক এবং না-ক এই দুটোই উপস্থিত থাকা। একটা অতিনির্ণীত কাঠামোয় এই উপস্থিতি খুবই উচ্চারিত : অতিনির্ণয়বাদী আলোচনায় একটা ক্ষেত্র (সাইট, এস আই টি ই) মানে অনেকগুলো বহুবচন এবং ক্যাঁচালপ্রবণ (প্লুরাল এবং কনফ্লিকচুয়াল) মুহূর্তের বা ইন্সটান্সের অবস্থিতি। এবার, একক ব্যক্তিকে, ইনডিভিজুয়াল-কে একটা ক্ষেত্র বলে ভাবুন। একজন ব্যক্তি ক একাধারে একটি শ্রমিক, একটি ভোটার, একটি স্বামী, একটি বাদামি মানুষ, একজন হিন্দু,

ইত্যাদি। অর্থাৎ, বহুমুখী বিচিত্রমুখী ডাইভারজেন্ট সব পদ্ধতি (অর্থনৈতিক, পারিবারিক, জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি) একত্রে কাজ করে চলেছে ব্যক্তি ক নামক ওই ক্ষেত্রের আধারে। শ্রমিক এই অবস্থান থেকে নেওয়া তার কোনো সিদ্ধান্ত বাদামি মানুষ হিশেবে তার স্বার্থের সঙ্গে কলহে চলে আসতে পারে। তার ধর্মীয় অবস্থান এবং রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পারস্পরিক মতান্তর থাকতে পারে। দ্বন্দ্ব নামক তাত্ত্বিক ধারণা এইরকম একটা সিচুয়েশনকে বেশ হ্যান্ডল করতে পারে। দ্বন্দ্ব দেখায় যে কী ভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, এখানে তার নাম ব্যক্তি ক, একই সাথে বিভিন্ন বিচিত্র বহুগামী মুহূর্তের কলহপ্রবণ উপস্থিতি ঘটতে পারে।

বিরোধ বা অ্যান্টাগনিজম, অন্যদিকে, শ্রমিক এই অবস্থানের নিরিখে একজন ব্যক্তির অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। একজন নারী শ্রমিক খ-কে ভাবুন। কারখানা বা অফিস যাওয়ার জন্যে তাকে খুব প্রত্যূষে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। আমাদের সমাজের অনেকগুলো স্তরেই, ঘরের বৌ-এর, বা ঘরের মেয়ের, এই প্রাত্যহিক প্রত্যূষতার প্রচুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। কী আর বলব? মানে, টেকনিকালি, খ-এর শ্রমিক এই অবস্থানের কিছু মেটাফোরিক উদ্বৃত্ত আছে, যে উদ্বৃত্ত অর্থগুলো সাংস্কৃতিক — যারা এবার তার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক এই অবস্থানে খ-এর পরিপূর্ণ উপস্থিতির। যখন যে কাজ করে চলেছে, সেই মুহূর্তেই, এই কাজ করে চলার ভিতরেই, খ-এর একটা গোপন যুদ্ধ বহমান, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, বরের বা শাশুড়ির সঙ্গে, যারা চায়না সে এই কাজটা করে চলুক। এটা খুবই সম্ভব যে খ-এর পাশের মেশিনে বা টেবিলে শ্রমরত পুরুষ শ্রমিকটির এই কারণে তার প্রতি একটা করুণা আছে, খ-এর দুঃখবেদনা সে খুবই ভালো ফিল করে, আর এই জন্যেই, ঠিক এই কারণেই, তারা দুজন কিন্তু কখনোই পরস্পর সমানতার স্তরে সঠিক অর্থে শ্রমিক কমরেড হতে পারে না। লামু ঠিক এই অর্থেই শ্রমিক শ্রেনী নামক বর্গের অন্তর্লীন অসম্ভাব্যতার কথা বলেন। শ্রমিক শ্রেনী তার নিজের অবস্থানেই সমাজের এত নানা বিভিন্ন মুহূর্তের মেটাফোরিক উদ্বৃত্তদের আমদানি এবং বহন করে যে শ্রেনী অবস্থানটা ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কখনো পুরোপুরি ঘটেই উঠতে পারেনা, নিজেই নিজের অস্তিত্বে — শ্রমিক শ্রেনী এই অবস্থানে — পৌঁছতে পারেনা। বিরোধ একটা তাত্ত্বিক ধারণা যা এই সীমাটাকে চিহ্নিত করে।

তাহলে, এই সীমাকে নাকচ করে কে? কে এবং কী ভাবে তৈরি করে এবং টিকিয়ে রাখে একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শগত অবস্থানের নিজ-পরিচয় বা আইডেনটিটি — সব আইডেন্টিটিই তো এখন সাময়িক, শর্তাধীন, অস্থায়ী, এবং পরিবর্তনযোগ্য, প্রভিশনাল এবং নেগোশিয়েবল? লামু আসলে তাদের নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনি নামক তাত্ত্বিক ধারণাকে ব্যবহার করে এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। মতাদর্শের জগতের বা এই জগতের খুব নিকটাত্মীয় যে সব উপাদান, যাদের সমবেত করে তৈরি হবে একটা মতাদর্শগত অবস্থান — বিভিন্ন বোধ, অনুভূতি, চিত্রকল্প, শব্দ — যে অগণ্য কোটি কোটি দ্যোতক (সিগনিফায়ার) ভেসে বেড়াচ্ছে লঘু বাতাসে, যেন কেউ লগি বাড়িয়ে পেড়ে নেবে তার অপেক্ষায়, তারা সম্মিলিত একত্রিত একদেশিত হয় কী করে? কে তাদের নিয়ে আসে এক পতাকার তলায়? কে এবং কী ভাবে তাদের জন্য রুটি, তরকারি, জল এবং ব্রিগেড যাওয়ার বাসের, এবং বাসের পেট্রোলের পয়সার ব্যবস্থা করে? লামু বলছেন এটা ঘটে একটা অনুপ্রবেশ-এর মাধ্যমে। ভেসে বেড়ানো সেই মেঘের ভিতর, সময়ের কোনো কোনো সন্ধিক্ষণে সময়ের বা পর্বতের কোনো কোনো উচ্চতায় এমনকী তারা কুয়াসা হয়ে ঢুকে আসে ঘরের ভিতর অব্দি, বিছানায়, প্রেমে, স্বপ্নের পরীদের ডানায় পর্যন্ত — তাদের সেই ভাসাভাসা সন্ধ্যাভাষার সফ্‌ট-ফোকাস পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিক কিন্তু প্রত্যাশিত রকমে ঢুকে আসে, অনুপ্রবেশ করে একটা স্পষ্ট, উচ্চারিত, আঙ্কিক রকমের নির্দ্বিধায়, একটা নোডাল পয়েন্ট, একটা দিকচিহ্ন, আপেক্ষিক স্থিরতার একটা বিন্দু, গাছের গায়ে গিঁট যেমন, বা একটা ঢেউয়ের চুড়ো। অনুপ্রবেশ করে আর করেই এটাকে তার রাজত্ব করে ফেলে। পুরোটাকে একটা (প্র)লেপের মত ঢেকে ফেলে — 'কুইল্ট' করে ফেলে এই 'নোডাল পয়েন্ট', লামুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এই লেপটা তাদের এবার নিজের নিজের অর্থের বিন্দুতে ফিক্স করে দেয়, আর নড়তে দেয়না, পিছলে যেতে দেয়না। এই নোডাল পয়েন্টটাতেই তৈরি হয় হেজেমনি, নিয়ন্ত্রণ।

হেজেমনি মানে, নিছকই, একটা রাজনৈতিক ধাঁচের সম্পর্ক, রাজনীতির একটা আকার বা ফর্ম বলাই যায় যদি কেউ চায় কিন্তু, কখনোই সামাজিক-এর মানচিত্রে একটা সুনির্ণীত অবস্থান নয়।

একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় একাধিক হেজেমনিক নোডাল পয়েন্ট বা নিয়ন্ত্রক দিকচিহ্ন থাকতেই পারে। মানে, সহজ কথায়, হেজেমনি একটা সাংগঠনিক নীতি, অর্গানাইজিং প্রিন্সিপল।

একটা সরল হেগেলীয় ভূমিতে, সিম্পল স্পেস-এ, এই সাংগঠনিক নীতিটা আসে ভিতর থেকেই। তার এসেন্স বা ইউনিভার্সাল-এরই আর একটা রূপভেদ, যে এসেন্স থেকে প্রবাহিত হচ্ছে এই সরল সমগ্রের অংশরা, পার্টিকুলাররা। যখন এই হেগেলীয় ভূমিটা পুর্ননির্মিত, রিকন্সট্রাক্টেড, অর্থাৎ, একটা কমপ্লেক্স স্পেসে এই অর্গানাইজিং প্রিন্সিপলটা তার মুখ লুকিয়ে থাকে, ছদ্মবেশে, পুর্ননির্মিত ওই 'যেন-বা' ('অ্যাজ-ইফ') সর্বব্যাপী-তে, সারোগেট ইউনিভার্সালে, তার সারোগেট কানাই-জননী এসেন্সে। এই অ-যথার্থ এসেন্স এবার একটা অ-যথার্থ অর্থ-নির্মাণ প্রক্রিয়াকে নিক্ষেপ করে সাংস্কৃতিক এর উপর, তৈরি করে একটা ফলস কনশাসনেস, মায়া চেতনা। পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যার শাঙ্করিক মডেলে যাকে অপরা চেতনা বলেও ডাকা যেতে পারে। আর, একটা অতিনির্ণীত কৃত্রিম ভূমিতে, সিন্থেটিক স্পেসে, ওই ছদ্মবেশেরা পড়ে খসে, অ্যাকচুয়ালি, পরিত্যক্ত হয়, অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত হিশেবে। যোগীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাওয়ার পর মানিনী রাধার মানভঞ্জণে ঝুলেলাল যেমন এবার দাঁড়িয়েছিলেন, প্রকাশ্য, মুক্ত, স্মার্ট এবং রিল্যাক্সড। ওই অর্গানাইজিং প্রিন্সিপল এবার সে ঠিক যা সেই রকমেই সামনে আসে, সাংগঠনিক নীতি এবার বাংলাবাজারে ল্যান্ড করে তার নিজেরই চেহারায় — এবার তাকে তার মত করেই চেনা যায় — সমাজপদ্ধতি সংগঠনের একটা আকার : হেজেমনির আধার।

> হেজেমনি মূলতঃ মেটোনিমিকাল। এর প্রভাব সবসময়েই তৈরি হয় একটা উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে, যে উদ্বৃত্ত অর্থ জন্মায় একটা স্থানান্তরণের বা ডিসপ্লেসমেন্টের ফলে।

এই মেটোনিমিক উদ্বৃত্ত অর্থরা এবার বিভিন্ন মুহূর্ত বা ইনস্ট্যান্স-এর উপচে পড়া উপরি উদ্বৃত্ত দিয়ে প্রদত্ত পরিচিতি বা আইডেনটিটিগুলোর ফাঁক বা গ্যাপ-গুলোকে ভরাট করে, সীমা বা লিমিট-দের অতিক্রম করে। স্লাভোই জিজেক হেজেমনির কার্যপদ্ধতিকে বোঝাতে গিয়ে উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন :—

> আমরা যদি এই ভাসমান দ্যোতকগুলোকে 'কমিউনিজম'-এর 'লেপ' দিয়ে ঢাকি, উদাহরণ হিশেবে বলা যায়, এই 'শ্রেনী সংগ্রাম'-ই তখন অন্য প্রতিটি দ্যোতক-কে, সিগনিফায়ার-কে, অভিষিক্ত করে এক একটা সুনির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত অর্থে : 'গনতন্ত্র'-কে (তথাকথিত 'যথার্থ গনতন্ত্র' বলে একটা নয়া অর্থকে দাঁড় করানো হয় 'বুর্জোয়া প্রাতিষ্ঠানিক গনতন্ত্র'-র বিপরীতে, যা শ্রেনী-শোষণেরই আর একটা আইনসম্মত উপায়) 'নারীবাদ'-কে (নারীর শোষণ যা শ্রেনীবিভক্ত সমাজের শ্রমবিভাজন থেকে উপজাত) 'পরিবেশবাদ'-কে (মুনাফালোভী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফলশ্রুতি প্রাকৃতিক সম্পদের এই ধ্বংসসাধন) 'শান্তি-আন্দোলন'-কে (শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ) ইত্যাদি।
>
> ... এইভাবে, একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শগত অবস্থানের প্রতিটি উপাদানই একটা সারিবদ্ধ তুল্যমূল্যতার, সমতা-সম্পর্কের, অংশ : তার মেটাফোরিক উদ্বৃত্ত, যা দিয়ে সে নিজে যুক্ত থাকে তার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে, তারা এবার যেন পিছন ফিরে তাকায়, এবং পিছনে ফিরে গিয়ে নির্মাণ করে তোলে এই মতাদর্শগত অবস্থানের নিজ-পরিচয়টাকেই। কিন্তু এই শেকলে বেঁধে ফেলা সম্ভব মাত্র একটি শর্তে যে একটা নির্দিষ্ট দ্যোতক — লাকাঁকথিত 'এক' — 'লেপ' হয়ে ছেয়ে ফেলে গোটা অবস্থানের সমস্ত দ্যোতককে, এই মতাদর্শগত অবস্থানকে মূর্ত করে তোলে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে এর নিজ-পরিচয়ে, আইডেনটিটিতে।

তাই লামুর তত্ত্বে হেজেমনি সম্ভব হয়ে ওঠে একটা উন্মুক্ত তত্ত্বকাঠামোর ভিতরেই কিছু নির্দিষ্ট দ্যোতকের একটা বিশেষ ধরনের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এবং নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়ে উঠতে পারার উপর দাঁড়িয়ে। হেজেমনি কোনো এসেন্স নয়, আবার কোনো মায়া-চেতনা, ফলস কনশাসনেসও নয়। জাস্ট একটা হোমরাচোমরা দ্যোতক যা তার উদ্বৃত্ত অর্থের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্যান্য আপামর আম-দ্যোতকদের।

১১।। লামুর হেজেমনি পেরিয়ে

তাই, সংক্ষেপে, হেজেমনি একটা সমাপ্তি নিয়ে আসে উত্তরআধুনিক সামাজিক-এর অন্তহীন উন্মোচণে। রেউ-র তত্ত্বে যে রোল প্লে করেছে এন্ট্রি-পয়েন্ট। অবশ্যই এই সমাপ্তি একটা শর্তসাপেক্ষ আপাত সমাপ্তি — কাজ-চালানো গোছের। কিন্তু যাই হোক, সমাপ্তি তো বটেই। আর এই সমাপ্তি আবার ডেকে নিয়ে আসছে একটা সূক্ষ্ম-শরীর

হেজেমনিকে। যাকে আমরা বুঝতে চাইছি অতিনির্ণয়ের নকল, মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন দিয়ে। গ্রামশির হেজেমনি ছিল এসেন্স দ্বারা আক্রান্ত, তাকে সেই এসেন্সবাদী নোঙর থেকে নড়িয়ে আনার কৃতিত্বটা লামুর। কিন্তু, মাঝখান থেকে, এই করতে গিয়ে গ্রামশির হেজেমনি-ধারণার কিছু খোঁচ, কিছু ধারালো খাঁজও হাওয়া হয়ে গেছে। হেজেমনির উৎসকে যারা তীরবিদ্ধ করে দিতে পারে, গেঁথে দিতে পারে। ওই যে ওই, আঙুল তুলে দেখাতে পারে। লামুর হেজেমনিটা হয়ে গেছে এই তুলনায় একটু গোলগোল। অতিনির্ণয়ের নকল আবার সেই শানটা ফেরত আনতে পারে উত্তরআধুনিক হেজেমনির দাঁতে নখে। মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন আবার সেই হেজেমনির উৎসের মুহূর্তটাকে পুনরুদ্ধার করে দিতে পারে : কী করে একটা সাংস্কৃতিক ভূমি আর একটা সাংস্কৃতিক ভূমিকে চমকায়, রোয়াবি দেখায় এবং শাসন করে। মোদ্দা কথা, ডমিনেট করে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, অতিনির্ণয় মানে সবাই সবার কারণ, প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের কার্য, অর্থাৎ, যেন এককথায়, কারুরই অন্য কারুর চেয়ে কারণ হিশেবে কোনো অধিকতর গুরুত্ব নেই, তাই, আমরা সবাই সমান। কিন্তু সত্যিই কী সমান? সমান রকমের সমান? উত্তরআধুনিকতার মহাসমুদ্রে সমানতার এই মহামন্ত্র গাইতে গাইতে নাও বাইতেই বাইতেই কি আমাদের চোখে পড়েনা, বাজার নামে একটা বাজে ব্যাপার আর তার ধারাবাহিক কেলেঙ্কারি? একধরনের একটা মাফিয়ারাজ যে চালিয়েই চলেছে, যেখানে, আমরা কেউ কেউ অন্য অনেকের চেয়ে একটু বেশি সমান, সমানতা কোথাও কোথাও একটু বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রবিশঙ্কর তো তার জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই থাকেন কালাপানির ওপারে, কিন্ত, গুরু, বলো, কোলকাতা তো শালা আধুনিকই হতে পারল না, মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে জীবনে একবার একটিবার গুরু নজরুল মঞ্চে ফাটিয়ে নাচতে পারলাম না। আমাদের অ্যাকাডেমিকদের কাকারবে ভরে যায় বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, তার সামনের ফুটপাত গুলো অব্দি, অথচ কটা আসে বিদেশ থেকে এপারে, এমনকী ঋতুভিত্তিক প্লেন-কনসেশন চালু থাকা সত্ত্বেও? না, না, সুবো না, অরিজিনাল সাদা-চামড়াগুলোর, সাহেবগুলোর, কথা বলছি। এটা একটা ভবিতব্য। হবেই। অতিনির্ণয়ের মধ্যেই রয়ে যায় অতিনির্ণয়ের নকল, মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন। নকল কী ভাবে তৈরি হয় বাসনা থেকে, সে কথা তো আমরা আগেই বলেছি। মানে, সমানতার গল্পে অনেকটা জল আছে। এবং, হায়, লামুর তত্ত্বে কোনো এফেক্টিভ জলোমিটার নেই। আমাদের মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন সেই যন্ত্রটা সাপ্লাই দিতে পারে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য আলোচনা।

লামুর ব্যাপারে আমাদের মন খচখচ করা কিন্তু শুধু এটুকুই না। আরো অনেক কোশ্চেন আছে আমাদের। যেমন ধরুন, সমাপ্তির ওই নীতি কী গোটা সমাজপদ্ধতির প্রতিটি স্তরে প্রতিটি আনাচে কানাচে সমান ফর্মা দেখাতে পারে? সমান তীব্রতায় ছড়িয়ে যেতে পারে আস্ত সামাজিকের শরীরে? সমাপ্তি নিজেই কি একটা বাহক হয়ে পড়বে না সামাজিক-এর আদত অসম্ভাব্যতার? গজিয়ে তুলবে না নিজেরই কিছু সিম্পটম? তখন, সেই সব সিম্পটমের সামনে দাঁড়িয়ে করণীয় কী?

আমরা এটাই ঘোষণা করতে চাই, যে, উত্তরঔপনিবেশিক লেখালেখি (উন্নয়ণ বিদ্যা, সংস্কৃতি বিদ্যা, ডিভলপমেন্ট স্টাডিজ, কালচার স্টাডিজ) পুরোটাই ওইরকম সব সিম্পটমের প্রতিক্রিয়ালব্ধ। যদি হাইব্রিড স্পেস বা সিন্থেটিক স্পেস-এর এমন একটাও নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র অর্থ থাকে যা সিম্বলিক স্পেস থেকে আলাদা — সেটা হল একটা নির্দিষ্ট সিম্পটমের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে : তৃতীয় বিশ্ব হল প্রথম বিশ্বের সিম্পটমের একটা প্রতিক্রিয়া। তৃতীয় বিশ্ব গজিয়ে ওঠে প্রথম বিশ্বের সিম্পটমের বিপরীতে। উত্তরআধুনিক লেখালেখি প্রথম বিশ্বকে এমন একটা সত্তা বানিয়ে তোলে যে তার সিম্পটমগুলোকে ছড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাড়িয়ে দিতে পারে না। হাফ-ওয়ে হাউজ বা মাঝ-নদীর চরের মত হাফ-ওয়ে উত্তরআধুনিকতা, এবং তার অপরিপক্ক অর্ধসমাপ্ত আখাম্বা তাত্ত্বীকরণ তৃতীয় বিশ্ব এই প্রশ্নটার কোনো সমাধান করতে পারেনা, অনন্তকাল ধরে শুধু ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু মাঝেমাঝেই, অরোধ্য এবং অবশ্যম্ভাবী রকমে, একটা সিম্পটমের মত পুনরাবর্তনে, তার কুৎসিৎ মুন্ডু জাগিয়ে তৃতীয় বিশ্ব জানান দেয়, আমি আছি, আমাকে ভুলে যেওনা।

এবার তাই চালু তৃতীয়-বিশ্ব-বিদ্যার (থার্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজ) জায়গায় আমরা প্রস্তাব একটা নতুন তৃতীয়-বিশ্ব-বিদ্যার। যেখানে শুধু হাওয়ায় ঝোঝুল্যমান ত্রিশঙ্কু হাইব্রিড স্পেস-দের জীবনচরিতই লেখা হবেনা। আমাদের

চিহ্নিত করে দিতে হবে এদের সীমাগুলো। এবং নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত আলোচনায় হেজেমনিক ডিসকোর্সে এই সীমা গুলো কী ভাবে সমাপ্তি বা ক্লোজার পায়। তারপরেই আসে ওই হেজেমনিক ক্লোজার গুলোর জেরা-জবানবন্দী এবং এদের বিরুদ্ধে মামলা লড়া। যাতে সমাজকাঠামোর সিম্পটমগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি একান্ত কথোপকথনে আসতে পারি আমরা। তখন আমরা দেখতে পাব — কী ভাবে অন্যান্যরা এব্যাপারে রিঅ্যাক্ট করছে — খুড়োর কলের ডান্ডার মাথায় একগুচ্ছ ইডিওলজিকাল ফ্যান্টাসি বা মতাদর্শগত খোয়াব ঝুলিয়ে দিয়ে। সিম্পটম না বলে আমরা তাদের ডাকব সিন্থোম বলে। মানুষ যখন তার অসুস্থতার সিম্পটমগুলোকে ভালোবেসে ফেলে, তার স্বসংজ্ঞায়িত ব্যক্তিত্বের অংশ করে ফেলে, তখন তাদের বলে সিন্থোম। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের তাত্ত্বিক লেখালেখিকে সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায় এই সিন্থোম দিয়ে। অন্যত্র সে আলোচনা আমরা করেছি, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে। এখানে সে কথা থাক। আমরা, আমাদের জায়গায়, নিজেদের লেখালেখিতে, এবার অন্ততঃ আলবিদা জানাতে চাই এইসব তাত্ত্বিক খোয়াবদের। সিম্পটমের চোখে চোখ রেখে তাকাতে চাই। ঔপনিবেশিকতার, উত্তরঔপনিবেশিকতার সিম্পটমের। আপনারাও তাকান। প্লিজ, দেখুন, অসুখগুলোকে না-দেখলেই তারা নেই হয়ে যায় না। তাকান, দেখুন, সিম্পটম, রোগলক্ষণ, প্রেত, বাইরের তৃতীয় বিশ্বের নিকষ অন্ধকারে আপনার জন্যে হাতে ডাব নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনি কি সাড়া দেবেন? সাবধান, নিশির ডাক কিন্তু।